# একতারা

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

চল্‌তি নাটক-নভেল এজেন্সি
৪৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

# বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের
# স্মৃতি-তর্পণ

প্রবাসীতে যে একতারা বেরিয়েছিল—তা'তে ছিল শুধু একটি সুর। ঝঙ্কারের বিস্তার ছিল না। কসরৎ ক'রে বাজাবার লোভ সাম্‌লাতে পারলাম না। সুর-শিল্পী অজ্ঞই হোক্, আর বিজ্ঞই হোক্, সে একটু কালোয়াতি করতে চায়—মনের আনন্দে। শ্রোতার তৃপ্তি বা অতৃপ্তির দিকে তার দৃষ্টি থাকে না। একটু সহানুভূতির চোখে দেখ্‌লে—অপরাধটা খুব অমার্জ্জনীয় মনে হয় না।

কাব্য যে সংসার-বিষবৃক্ষের একটি মধুর ফল, এই মহাজন-বাক্যই একতারার সুর। সে সুর আমার ক্ষীণ কণ্ঠে কতটুকু উচ্চারিত হ'ল—তার বিচারক আমি নই। গল্পাংশে কোনও রূপক আছে কিনা, আর আমার পক্ষে সেই দুরূহ রূপক-রচনার দুঃসাহস, তিরস্কার বা পুরস্কারযোগ্য কিনা, তাও নির্দ্ধারিত হবে—সাহিত্য-রসিকদের দরবারে।

ভাগ্যে যাই থাক্—ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হয়েই একতারা বাজিয়েছি—পুণ্যস্মৃতি রবীন্দ্রস্মরণে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া<br>১৩৫৯ } **শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়**

# একতারা

—:০:—

( ১ )

মানুষের অন্তরে যে এত মধু আছে, রাজকুমারী শোভা তা জানতো না। ভ্রমরের মত নিত্য সে ছুটে আসে জীবনকবির পাশে।

অতিবৃদ্ধ জীবনকবি একতারা বাজিয়ে গান গায়। যৌবনের গান। উন্মাদনা ও উদ্দীপনার গান। তন্ময়চিত্তে শোভা শোনে। রক্তপ্রবাহে অনুভব করে প্রাণের স্পন্দন ও যৌবনের চাঞ্চল্য। আনন্দের আতিশয্যে খুঁজে পায় বেঁচে থাকার সার্থকতা।

ধনীর দুলালী শোভা। প্রচুর ভূসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। শোভার মা রাণী-বসুন্ধরা চান, শোভা তার ধন-সম্পদের মাদকতায় মেতে উঠুক। দারিদ্র্যকে ঘৃণা করতে শিখুক। রত্ন-সিংহাসনে বসে, পা দু'খানা রাখুক স্বর্ণ-কমলের পা-দানীতে। তার পদরেণুপ্রার্থী হোক—অন্নহীন ও বস্ত্রহীন

ছুর্গত জন-সাধারণ। কিন্তু শোভা চায়—দীন হীন জীবনকবির ভাঙা কুটিরে গিয়ে বসে থাকতে। প্রকৃতির পূজারিণী হতে। কাব্যরসে প্রাণমন অভিষিক্ত করতে। এই রুচি-বৈষম্য নিয়ে মা ও মেয়ের মধ্যে এমন মত-বিরোধ বেধে ওঠে, যার কোনো মীমাংসা হয় না।

শোভা জিদ্ ধ'রে বলে—কবিকে আমি ভালবাসি। তার সঙ্গ আমার ভাল লাগে। কবির কুটিরে আমি যাবই···

অতিবৃদ্ধের প্রতি মেয়ের এই অস্বাভাবিক অনুরাগকে অন্য কোন উপায়ে বিঘ্নিত করতে না পেরে, বসুন্ধরা বলেন—তা'হলে কবিকেই ডেকে আন এখানে। তুমি কেন যাবে সেই নোংরা—গরীবের আস্তানায় ?

শোভার প্রতিবাদ-প্রবৃত্তি স্তিমিত হ'য়ে আসে। বসুন্ধরার এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারে না সে। মনে মনে ভাবে—কবি কি আসবে এখানে ?

বিরাট সৌধ। পুষ্পোদ্যানে ঘেরা। কৃত্রিম ফোয়ারার উচ্ছ্বসিত জলধারার গায়ে রামধনুর সাতরঙা খেলা। নগ্ন নারী ও পুরুষের লীলায়িত প্রস্তরমূর্ত্তি দিকে দিকে সাজানো। মাঝে মাঝে লতাকুঞ্জ ও পুষ্পবীথি সুগন্ধী সুষমায় স্নিগ্ধ। দীঘির কালো জলে পদ্মরাগ, আর হংস-মিথুনের জলকেলি। সুখ-সম্ভোগের বহুবিধ উপাদানে সুবিন্যস্ত রাজপ্রাসাদ। বসুন্ধরার ইচ্ছা—শোভা এই প্রাচুর্য্যের দোলায় দোলে। কিন্তু শোভার মন কেন বাহ্যসুখৈশ্বর্য্যে ভোলে না ?

সঙ্গীহীন অষ্টাদশী শোভা চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় যেন চঞ্চলা হরিণী। বসুন্ধরা তাকে সাজান নানাবিধ বেশভূষা ও অলঙ্কার দিয়ে। শোভা চায়, দেহের বিলাস নয়, মনের খোরাক। সে কথা বসুন্ধরা বোঝেন না। তিনি জানেন, দেহের অধীন মন। শোভা অনুভব করে, মনের অধীন দেহ। রাজপ্রাসাদে শোভার মন-প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাই সে ছুটে যায় কবির কুটিরে। বসুন্ধরার প্রতিবাদ গ্রাহ্য করে না।

জীবনকবির হাত দু'খানা চেপে ধরে শোভা বলে—কবি! চলো আমাদের প্রাসাদে। সেইখানেই তুমি থাকবে।

জীবনকবি হেসে জিজ্ঞাসা করে—কেন বলো তো?

—আমি আর ছুটোছুটি করতে পারি না……

—তাই নাকি? কবি হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে—না, রাজকুমারী, তা হয় না। এই কুটিরের দীনতাই ভাল লাগে আমার। প্রাসাদের অহঙ্কার সইতে পারিনা।

শোভা দুঃখিত হয়। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হ'য়ে ওঠে। বিমর্ষ-ভাবে জিজ্ঞাসা করে—রাজপ্রাসাদের সুখৈশ্বর্য্যকে মূল্যহীন মনে কর কেন? জীবন-ধারণের সুখ-সুবিধা কি নিরর্থক?

দুগ্ধধবল শ্বেত-শ্মশ্রূতে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করে জীবনকবি বলে—অর্থ হয়তো একদিন কিছু ছিল। যে দিন মানুষ ছিল দেবতা। আজ সে পশু হয়ে উঠেছে। তাই, অর্থও হয়ে উঠেছে বহু অনর্থের কারণ……

—তার মানে ?

—বল্‌তে পার, জীবন-ধারণের উদ্দেশ্য কি ? তুমি কি চাও ?

শোভা ঠিক বল্‌তে পারে না। এই মুক্ত আলো-বাতাসে স্বচ্ছন্দ লতাপাতা-ঘেরা কুটিরে এসে, কবির পাশে বসলেই তার প্রাণে জাগে মুক্তির আনন্দ। এই আনন্দই তো মানুষের কাম্য ? প্রাসাদে কেন আনন্দ নেই ? দাসদাসী সবাই তো আছে সেখানে। শুধু কবি নেই। কবিও যদি যেতে রাজী হয়—তাহলেই তো হয় প্রাসাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ? সেখানেও তো কবি পারে—একতারা বাজিয়ে নেচে নেচে গান গাইতে ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শোভা বলে—বুঝতে পেরেছি কবি, তুমি কি বলতে চাও······

—কি বলো তো ?

—তোমার মনে আছে দৈন্যে অহঙ্কার! তাই তুমি প্রাসাদের প্রাচুর্য্যকে ঘৃণা করো।

—ঠিক বলেছ। দৈন্যের অহঙ্কারই বাঁচিয়ে রাখে মানুষের মনটাকে। তাই তো এ পাকা চুলেও বেঁচে আছি আমি। মাথাভরা কাজল-কালো কেশদাম নিয়েও তুমি এত ছটফট্ করছো। কেন জানো ?

—কেন বলো তো ?

—বাঁচার তাগিদে। ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে মরে যাচ্ছ তুমি। প্রাসাদের বন্ধনভীতি তোমাকে শঙ্কিত করে তোলে। এখানকার

আলো-বাতাসে যে মুক্তির আনন্দ আছে, সেখানে তো তা নেই ?

—কেন নেই, সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি…

—প্রাসাদের ভোগ-বিলাস মানুষের সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্টির চেয়েও, মানুষ যে কত বেশী সুন্দর ও মধুর তা' বুঝি যখন এখানে থাকি। সেখানে গেলে বুঝবো কেন ? আমি ভালবাসি আমাকে। বিলাসের ষোড়শোপচারের মধ্যে ডুবে গেলে—নিজেকে তো আর খুঁজেই পাবনা ? তোমাকেই আমি দেখতে চাই। তোমার ওই রঙিণ বেশ-ভূষা, আর অলঙ্কারের চাক্‌চিক্য তো তুমি নও ? ওগুলো তোমার উপাধি।

—তার মানে—আমি রাজকুমারী ?

—হ্যাঁ, শোভা অদৃশ্য হ'য়ে যায় রাজকুমারীর আড়ালে। ঐশ্বর্য্যের আবর্জ্জনায় পড়ে ঢাকা…

—তাই নাকি ? শোভা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। সে কথা এত দিন বলো নি কেন ? কাল থেকে আমি আসবো সম্পূর্ণ নিরুপাধিক। একেবারেই নিরাভরণা ! পাথরের নগ্ন মূর্ত্তিগুলোর মত নিখুঁৎ অঙ্গ-সৌষ্ঠব নিয়ে। কি বলো ? তাহলে তো আমি হবো—অতি সুদৃশ্য শোভা ? বলেই সে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। এলিয়ে পড়ে বৃদ্ধ কবির গায়ের উপর। একতারার তার ছিড়ে যায়। অতি বৃদ্ধের লোল চামড়ায়ও জাগে রোমাঞ্চ !

—কী মুস্‌কিল ! আমি কি তাই বলেছি…জীবনকবি

বিরক্তি প্রকাশ করে। দূরে সরে যায়। গম্ভীর ভাবে এক-তারার কান মুচ্‌ড়ে আবার সুর বাঁধে। বার্দ্ধক্য যেন আত্মরক্ষা করে উন্মাদ-যৌবনের আক্রমণ থেকে। তবু সে উন্মাদনা তার অনভিপ্রেত নয়। তাকে আবাহন না করেও পারে না। তাই কবি নেচে নেচে গায়—

যৌবনের এই মৌবনে তুই
পাগলা হরিণী!
তোর কারণেই বেঁচে আছি
আজও মরিনি।
অস্ত রবি আমার পাটে—
ঊষার আলো তোর ললাটে!
তাইতো চেয়েই থাকি—আঁখি-
জলে ভরিনি।

নাচের ও গানের তালে শোভার প্রাণও নাচে। মন আর চায়না প্রাসাদে ফিরে যেতে। আকুল আগ্রহে জীবনকবির হাতখানা ধরে শোভা বলে—দোহাই কবি! অন্তত একবারটি চলো আমার সঙ্গে—প্রাসাদে নয়……

—তবে কোথায়?

—বাইরের ফুলবাগানে…

—কেন?

—তুমি যা চাও, সেখানে তা আছে…

—কি চাই? কি আছে? কবি হাসে।

—অটুট যৌবন মূর্ত্ত্য হ'য়ে আছে, নিখুঁৎ ভাস্কর্য্যে! পোষাক নেই, পরিচ্ছদ নেই, একেবারেই নিরাভরণ শিল্প-চাতুর্য্য! হ্যাঁ, তুমি যা চাও—ঠিক্ তাই···বলেই হাসতে হাসতে লুটোলুটি খায় শোভা। কবিকে জড়িয়ে ধ'রে বিভ্রান্ত করে। সে যেন হাল্কা হয়ে ওঠে উড়ন্ত পাখীর পেলব পাখার মত।

জীবনকবির গাম্ভীর্য্য বেড়ে যায়। বিপন্ন ভাবে বলে—ছিঃ দিদিমণি, জলকে তাতিও না। সে শুকিয়ে যাবে।

—তুমি জল?

—হ্যাঁ, তোমার ওই সুন্দর চোখের। ওই রক্তিম গাল দু'টি বেয়ে গড়িয়ে পড়ার আনন্দেই বেঁচে আছি। কিন্তু, আর ক'দিন? তোমার এই আনন্দের জোয়ারে যেদিন ভাঁটা লাগবে ঠিক সেই দিনই আমার এ ভাঙা বজরা বান্চাল হয়ে যাবে, নৈরাশ্যের চড়ায় ঠেকে। তুমিই তো আমাকে বাঁচিয়ে রাখছো······

একতারা বাজিয়ে কবি গায়—

তোমার ফুটে-ওঠা, আমার ঝরে-পড়া,
মিছে নয়, মিছে নয়—জানি।
জগতে চিরদিন—চলেছে ভাঙাগড়া,
মিছে শুধু হওয়া অভিমানী।
সমীরণ দিতে মোরে দোল, গন্ধে উদাস উতরোল,
আমিও ফুটেছি অনুরাগে—সে সুখ-স্বপন মনে জাগে,
দু'দিন ডেকেছে প্রিয়া, মোরে হাতছানি দিয়া—
আদরে সাজাতে ফুলদানী।

( ২ )

জীবনকবি জিজ্ঞাসা করে—শোভা! শুনছি নাকি তোমার বিয়ের প্রজাপতি ডানা মেলেছেন?

—হ্যাঁ……

—বিয়ের পরে তুমি কি এখান থেকে চলে যাবে?

—কেন যাবো?

—বর বুঝি এখানেই থাকবে?

—তাই বা কেন থাকবে?

—তবে?

—তবে আবার কি? আমিও যাবো না। সেও থাকবে না।

—তবে তো বিয়ের কোন মানেই হবে না……

—বিয়ের মানে কি?

—বাঁধন!

—না, না, বাঁধন নয়। সামাজিক প্রয়োজনে বিয়ে হয় হোক্। কোনো বাঁধনে নিশ্চয়ই বাঁধা পড়বো না আমি। শুনেছি তার একতারা নেই! কি দিয়ে আমাকে বাঁধবে সে? প্রতিপদের চাঁদের মত সেও হবে উদয়, আমিও যাবো অস্তে…

জীবনকবি হেসে বলে—আর, আমার এই নিষ্প্রভ চোখ-

দুটি বুঝি সান্ধ্যতারার মত চেয়ে থাকবে—তোমাদের সেই উদয়াস্তের সাক্ষী হ'য়ে ?

পূর্ণিমা তিথি। দিনের আলো আর নৈশ জ্যোছনার মিলন ঘটেছে অদূরে খরস্রোতা মধুমতীর বুকে। পিছনের দিকচক্রবালে অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান রশ্মি আর সামনের নদীবক্ষে উদীয়মান চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণ, সৃষ্টি করেছে এক আবেশ-মধুর স্বপ্ন-জাল !

আকাশের এক চাঁদ যেন হাজার টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নদীর জলে। সেই দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে শোভা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি, বল্‌তে পার—ওই চাঁদে কি আছে ?

—জ্যোছনার মায়া······

—আর কি ?

—জানি না। জানতেও চাই না······

—কেন ?

—সেখানে সাপ আছে কি বাঘ আছে, তা' জেনে আমার কি লাভ ?

—তুমি তো বেজায় ব্যবসাদার !

—কেন ?

—এত লাভ-লোকসানের হিসেব করো কেন ?

একটু হেসে জীবনকবি বলে—তোমার ভিতর কি আছে জানো শোভা ?

—কি ?

—অতি কুৎসিৎ কঙ্কাল !

—তা' যদি থাকেই, তুমি দেখতে চাও না কেন ? ভয় পাও বুঝি ?

—হ্যাঁ, ভয় পাই। শুধু ভয় পাই না, কঙ্কালকে অত্যন্ত ঘৃণাও করি। তোমার সেই কঙ্কাল সত্যিও নয়, সুন্দরও নয়। ওই আবেশমাখা কমনীয় চোখদুটি উপড়ে ফেলে, ওখানে একটা বীভৎস গহ্বর তৈরি করার কি কোন মানে হয় ? ওই বাঁধুল-রাঙা ঠোঁট দু'খানি বাদ দিলে, মুক্তোর মত দু'পাটি দাঁত যে কত কুৎসিৎ দেখাবে, তা জানতে কেন যাবো আমি ?

—তুমি জানতে না চাইলেই কি সে মিথ্যে হ'য়ে যাবে ?

—সত্যিও হবে না। যা অসুন্দর তাইতো মিথ্যে ! কঙ্কাল যখন ভিতর থেকে বাইরে এসে সত্যি হতে চেষ্টা করে —তখনি আসে এই কদর্য্য বার্দ্ধক্য। জরা বা বার্দ্ধক্য মিথ্যা বলেই প্রাণ তাকে ত্যাগ করে। প্রাণের প্রাচুর্য্য নিয়ে যৌবন যখন মেতে ওঠে, তখন কঙ্কাল থাকে চোরের মত লুকিয়ে। যৌবনকে সে ভয় করে। বার্দ্ধক্যকে করে জয়।

—তোমার মত আমাকেও একদিন সে জয় করবে ? আমারও আসবে বার্দ্ধক্য ?

—নিশ্চয়ই। ও নিটোল-গঠন মৃণাল-বাহু, আর কনক-চাঁপা-আঙুল তো চিরদিনের নয় শোভা ? তাতে দুঃখ কি ?

যৌবন, মনের সম্পদ। দেহে বার্দ্ধক্য এলেও, আমি তো মনের যৌবন হারাইনি?

একতারাটা বাগিয়ে নিয়ে কবি নেচে নেচে গায়—

—যৌবনে বুক ভরা।
কত সুন্দর আর সুমধুর—
কত নয়নানন্দ ধরা!
অন্তর-তলে আছে কত মধু—
সে গোপন কথা জানে দিক-বধূ!
তাই ফোটে ফুল, গন্ধে আকুল,
মলয়া—পাগল-করা।
উষা হাসে মোর বাতায়নে আসি
বিহগ-কাকলী কত ভালবাসি—
পুলকিত কায়—দেখি আঙিনায়
চাঁদের জোছনা-ঝরা।

শোভা বোঝে—যৌবনই সত্যের দ্যুতি, আর বার্দ্ধক্য মিথ্যার অন্ধকার। প্রাণ চায়—জল, বায়ু আর আলোর পরমায়ু। বার্দ্ধক্যের বঞ্চনাকে অস্বীকার ক'রে, আনন্দময় যৌবনকে আঁকড়ে থাকাই প্রাণের ধর্ম্ম। নিরানন্দ বার্দ্ধক্য কেন আসবে —কবিকে প্রাণহীন করতে? একি অত্যাচার তার? হে ভগবান! কবিকে অমর করো। অজর করো।

শোভা চিন্তিত হয়ে পড়ে। কবি যদি চলে যায়, কে তাকে

শোনাবে এই যৌবনের জয়গান ? কার একতারার ঝঙ্কারে তার দেহমন হবে পুলকিত ?

লজ্জিতভাবে শোভা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি, বল্‌তে পার আমার বর কেমন হবে ?

জীবনকবি একটু হেসে বলে—অনেক আনন্দময় বৃদ্ধ দেখেছি। অনেক নিরানন্দ যুবকও দেখেছি। তোমার বর ইক্ষুদণ্ড হবেন—কি বেত্রদণ্ড হবেন—তা একটু না-চিবিয়ে বুঝবো কি করে ? জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ে—অন্ধকারের অদৃষ্ট-লিপি !

শোভা শিউরে ওঠে। এমন অচেনা-অজানার সঙ্গে হবে তার বিয়ে ? আগে কি তাকে চিন্‌বার উপায় নেই ? শোভা জিদ্‌ ধরে—তবু তোমাকে বল্‌তে হবে, কবি ! আমার বর কেমন হবে ?

কবি বলে—আমি তো গণৎকার নই ? তোমার বর এসে যদি জিজ্ঞাসা করে—'আমার বধূটি কেমন হবে ?' তা বল্‌তে পারবো……

—কি বল্‌বে—শুনি ?

—প্রশস্তি শুন্‌তে চাও ?

—শোনাও না। আপত্তি কি ?

—তোমার ক্ষতি করে তোমার বরের লাভ আছে। আমার লাভ কি ?

—কী ভয়ানক কথা। কি বল্‌ছো তুমি ? আমার ক্ষতি করে, তার লাভ ?

—বিয়ে যে কত জটিল, তা' বুঝবে বিয়ের পরে। হয় বর জিতবে, তুমি হারবে। আর না হয়—তুমি জিতবে, বর হারবে।

—দুজনাই জিতবো না ?

জীবনকবি হাসে। হাসতে হাসতে বলে—দৌড়ের ঘোড়া আগু-পেছু হবেই। তবে, বধুরা অনেক সময় হেরেও জেতে। বরেরা জিতেও হারে। বিয়ের হারজিত বাইরে থেকে আগে বোঝা খুব সোজা নয়। তার হিসাব-নিকাশ হয়—অন্তরের অনুভূতি দিয়ে—মানে ও অভিমানে, হাসি ও কান্নায়।

শোভা ঘাড় দুলিয়ে বলে—না, না, তাহলে আমি বিয়ে করবো না···

—তা কি হয় ? বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। যৌবনের রক্তরাগে বিয়ের কামনা তো মিথ্যে নয় ? ফুল যদি ফুটলো, তার পরিণতি যে ফল, সে তো ফল্‌বেই।

—আমার বর কেমন হবে, তা' না জেনে—কখ্‌খনো বিয়ে করবো না আমি······

জীবনকবি হেসে বলে—একই মাটিতে তেতো নিম, আর মিঠে আঙুর ফলে। ঘেঁটুও ফোটে, গোলাপও ফোটে। তোমার বর নিম হবে কি আঙুর হবে—ঘেঁটু হবে কি গোলাপ হবে, বিয়ের পরে তা' বুঝতে খুব বেশী বিলম্ব হবে না। তবে তা'তে ভয়ের কিছু নেই······

—যদি নিম হয় ?

—হতে পারে। আঙুরের স্বাদ যে জানে না, যৌবনরাগে নিমকেই সে মনে করবে আঙুর! বিয়ে নিস্ফল হবে না।

—কী ভয়ানক কথা!

—কথাটা মোটেই ভয়ানক নয়। কোন বস্তু আর তার জ্ঞান তো এক নয় শোভা! জ্ঞানী যাতে বীতশ্রদ্ধ, অজ্ঞানীর কাছে তা' পরম সম্পদ। দ্রব্যমূল্য তো নির্ভর করে চাহিদার উপর? তুমি যে নিমকেই চাইবে আঙুর ভেবে!

—না, না, এমন অনিশ্চিত বিয়ের ফাঁস্ গলায় পরতে আমি চাই না……

একতারা বাজিয়ে জীবন কবি গেয়ে ওঠে—

যদি, যৌবন-শতদল ফুটলো—
পরিমল লোভে অলি জুটলো!
দিতে তারে মৃদু দোল
সমীরণও উতরোল,
দিশেহারা হয়ে, সেও ছুটলো।
মুদিত নয়নে কুমুদিনী
ছিল একাকিনী বিরহিনী,
জ্যোছনা-পরশে জেগে উঠলো।

( ৩ )

শোভার বিয়ের বাজনা বেজে ওঠে। জীবনকবি শোনে কান পেতে। দূরাগত সানাইয়ের সুরে সুর মিলিয়ে সেও গায় গান। একতারাও বাজে। কিন্তু, তার ঝঙ্‌কার ওঠে না। তবু চলে আঙুলের কসরৎ। আনন্দে চোখের জল বেরিয়ে আসে।

সূর্য্য অস্তে গেছে। রক্ত ঢেলে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে পশ্চিম আকাশ। এই তো গোধূলি? বোধ হয় বরের হাতে শোভার হাত বাঁধা পড়েছে। সে বাঁধন কত নিবিড়, কত মধুর! শোভার কি ক্ষমতা আছে সেই বাঁধনকে অস্বীকার করতে পারে? কখনো পারে না। সে তো শুধু হাতের সঙ্গে হাতের বাঁধন নয়, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের।

জীবনকবি ভাবে—নিশ্চয়ই শোভা এখন বসেছে বরের পাশে। পাতলা ওড়নার ভিতর দিয়ে চুরি করে দেখছে বরের মুখ। কী সুন্দর বর! কী সুন্দরী বধূ! সার্থক এই যৌবন-যজ্ঞের আয়োজন। কত পবিত্র এই শুভ মিলন-মন্ত্র। সজল চোখদুটি মুছে জীবনকবি স্নেহাশীষ জানায়—বরবধূ সুখী হোক্! হে পরমসুন্দর! নবদম্পতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো…

শঙ্খধ্বনি শোনা যায়। এইবার নিশ্চয়ই বরবধূ বাসরে ঢুক্‌ছে। জীবনকবি নেচে ওঠে। একতারা বাজিয়ে গায়—

জাগো বরবধূ যৌবন-কুঞ্জে !
অন্তর-মধু-সন্ধানী,
সার্থক এ যৌবন-যজ্ঞের আয়োজন
সার্থক এ মিলনের বাণী।
বন-কুন্তলে ঝরে জোছনা-ধারা
অপলক চোখে চাহে সান্ধ্য তারা,
দুটি হৃদি-বিনিময় যেন চিরশুভ হয়
এ মিলন মধুময় জানি।

পরের দিন প্রত্যূষেই শোভা ছুটে আসে—জীবনকবিকে প্রণাম জানাতে। ঢিপ্ করে পায়েব উপর মাথাটা রাখতেই রাঙা রঙ লাগে কবির পায়ের পাতায়। শোভার কপালের সিঁদুর যায় মুছে। একটা অশুভ আশঙ্কায় জীবনকবি চম্‌কে ওঠে। তবু মুখে আশীর্ব্বাদ জানায়—এ সিঁদুর অক্ষয় হোক্! হে পরমমধুর! এদের জীবন মধুময় করো……

শোভা অসঙ্কোচে বলে—বর যে এত সুন্দর, এত মধুর, তাতো জানতাম না কবি!

—তাই নাকি? জীবন কবি হো হো করে হেসে ওঠে। অনুসন্ধিৎসুভাবে জিজ্ঞাসা করে—বধূর সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যে কত, তাও কি বর জেনেছেন?

শোভা নতমুখে চুপ্ ক'রে থাকে। সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। শীর্ণ হাতখানা মাথার উপর রেখে কবি আবার আশীর্ব্বাদ করে—এ মিলন স্থখের হোক্—শান্তির হোক্—অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু·········

লজ্জিতভাবে শোভা বলে—তা'হলে এখন আসি?

—কোথায়, কতদূরে যাচ্ছ—তাতো বল্‌লে না? সজল চোখে জিজ্ঞাসা করে কবি।

—আমি তো জানি না। এখন যদি তিনি যমের বাড়ি নিয়ে যেতে চান্—তা'তেও আপত্তি করবো না—এইটুকুই জানি······ বলেই শোভা চুপ করে কি যেন ভাবে। উদাসভাবে চেয়ে থাকে দিগন্তের দিকে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি! বলতে পার—বর কি কোনো নেশার মত?

—হ্যাঁ, তোমার মত মেয়ের কাছে—তাই বটে······

—আমার মত মেয়ে কেন বল্‌ছো?

—দোষের কথা নয়। আমার এই একতারার গুণ। একটি তারেই তো তোমার স্থর বেঁধেছি আমি! কিন্তু খুব সাবধান!

জীবনকবি নেচে নেচে গায়—

যৌবন-জোয়ারে ভাসে নাও,
কাণ্ডারী ধরেছে পাড়ি—
পাগ্‌লা উতল বাও! ওরে!

অকুলে না যাওরে বঁধু—
কুলের পানে চাও।
মাঝ-দরিয়ার গভীর জলে—
কে জানে কোন্ অতল-তলে,
মন-ভুলানো মাণিক জ্বলে !
—তার লোভে না ধাও।

জীবনকবিকে ছেড়ে যেতে হবে। শোভার প্রাণ কাঁদে। এই নৃত্যগীত যে তার মনের খোরাক সে কথা শোভা ভুলতে পারে না। আকুল ভাবে কবির হাতখানা ধ'রে জিজ্ঞাসা করে —বলো তো কবি ! আমার বরও কি এইভাবে নেচে গেয়ে আনন্দ দেবে আমাকে ?

জীবনকবি একটু হেসে বলে—নাচ আর গান সবার ভিতরেই আছে। তুমি যদি নাচাতে পার—তাহলেই নাচবে। গাওয়াতে পারলেই, গাইবে। তুমিই তো সেই প্রকৃতি—পুরুষকে যে নাচায় ও গাওয়ায়। হাসায় ও কাঁদায়।

—আমি চলে গেলে—তোমাকে নাচাবে গাওয়াবে কে ?

—তোমার স্মৃতি ! জীবনকবির চোখ থেকে দু'ফোটা উষ্ণ অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শোভা চলে যায়। কবি সজল চোখে চেয়ে থাকে তার গতি-পথের দিকে।

জীবনকবির মনে অনুশোচনা জাগে—এই তো সে চলে গেল ! যৌবনের গান গেয়ে গেয়ে কেন সে শোভার ঘুমন্ত

মনটাকে জাগিয়েছিল। শোভাও তাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেয়নি। কিন্তু আজ?

ঘুমিয়ে পড়লেই তো কঙ্কালটা জেগে উঠবে। জীবনকবি ভয়ে শিউরে ওঠে। না, না, তা হতে পারে না। এখনো তাকে জেগে থাকতে হবে—ভাবী-কালের আগমনী গাইবার জন্যে। আত্মহারা কবি তখন একতারা বাজিয়ে নাচে আর গায়—

ওরে, আস্‌বে কে তা' জানি—
ফুলের বুকে কচি-হাতে ফলের ও-হাতছানি!
তারে, মানিরে ভাই মানি।
আমার হাতের একতারা সে—
হাত বাড়িয়ে ধরতে আসে—
জান্‌ছি আমি হারবো, তবু করবো টানাটানি।

চাষী-পল্লীর মাঝখানে কবির কুটির। তরুলতায় ঘেরা ও ফুল-পাতায় ঢাকা, পর্ণাচ্ছাদনেই সুখের সংসার পাতানো। কোনো অভাব নেই—অভিযোগ নেই। চাষী বালক-বালিকাদের অযাচিত সেবাযত্নে, আর স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূল-আহরণেই কবির পরিতৃপ্তি। পরমসুন্দরের উপাসক জীবনকবির উপদেশে ও আনুগত্যে স্বভাব-সরল চাষী-পল্লীতেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা বেড়ে উঠেছে। অসংখ্য অনুরাগী ভক্তশিষ্য সর্ব্বদাই ঘিরে আছে তাকে। একতারা সহযোগে কবির আত্মহারা ভাববিহ্বল নৃত্যগীত সকলকেই প্রচুর আনন্দ দান করে।

জীবনকবির প্রধান ভক্ত এক কৌপীনধারী, মুণ্ডিতমস্তক দার্শনিক। কবির জীবন-দর্শন তাকে উদ্বুদ্ধ করে। সহজ মনুষ্যত্ব-বিকাশের পথে—অনাবিল আনন্দধারায় সংযম ও সহিষ্ণুতার শিক্ষাকেই সে মনে করে, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষার একমাত্র উপায়। পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার সংঘাতে প্রাচ্য ভাবাদর্শ ক্ষুন্ন হচ্ছে। বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। এই চিন্তাই তাকে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী করেছে। সেও এসে আজ আশ্রয় নিয়েছে চাষী-পল্লীতে জীবনকবির পাশে।

রাজকুমারী শোভাকে দার্শনিক মনে করে—কঠিন ও নীরস রাজ-প্রাসাদের গা বেয়ে গড়িয়ে-পড়া করুণার নির্ঝর ধারা। শোভার অন্তর্ধান, দার্শনিককেও বিচলিত করেছে।

জীবনকবিকেও করেছে নির্জীব ও নিরুৎসাহ। একতারায় আর ঝঙ্কার ওঠে না।

হঠাৎ একদিন জীবনকবি তার একতারাটা আছড়ে ভাঙে। নাঃ আর পারি না।

শোভা না-থাকলে জীবনের আর কি থাকে? কে শোনে তার প্রাণের গান? কে তারিফ করে তার সুরের কসরৎ? কাকে উদ্বুদ্ধ করে যৌবনের প্রশস্তি? শোভাহীন জীবন, বেঁচে-থাকার বিড়ম্বনা বৈ আর কি?

কুটির-প্রাঙ্গণে তৃণশয্যায় শুয়ে জীবনকবি চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। ভর-দুপুরেও যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। এমন সুন্দর পৃথিবী! এত জল, এত আলো, এত বাতাস। চারিদিকে কী নয়নানন্দ সবুজের আস্তরণ! নানাবর্ণের ফুল ও ফলের শিহরণ। সবই যেন দূরে, বহুদূরে সরে যাচ্ছে। জীবনকবির ভিতর থেকে কঙ্কালটা মাঝে মাঝে চিৎকার করে বল্‌ছে—ম্যয় ভূখাহুঁ!

জীবনকবি বলে—ওরে অসুন্দর! ওরে মিথ্যে! যৌবন তোর আবেদন গ্রাহ্য করবে না। তোকে দেখলেই সে যাবে পালিয়ে। তবু তোর বাইরে আসার এ দূরাশা কেন? কেন আমাকে নিবিয়ে দিতে চাস্? জীবন-দীপের তৈলাভাব তো এখনো ঘটেনি? এখনো আমার মুখে আছে হাসি, চোখে আছে জল। শোভার কোলে যে নবীনের শুভাগমন হবে— এই জীবন ছাড়া তাকে অভিনন্দিত করবে কে? সে যে হবে

এই জীবনকবির অন্তর মধু। ওরে বীভৎস কঙ্কাল আমাকে বাঁচতে দে—বাঁচতে দে……

জীবনকবির কোটরগত চোখদুটি সজল হয়ে ওঠে। সে যেন হয়ে পড়ে একেবারেই দৃষ্টিহীন! তার কোন আবেদনই হৃদয়হীন কঙ্কালটার কানে পৌঁছায় না। সে আরো জোরে চিৎকার করে—ম্যয় ভুখাহুঁ! তবু কবি বোঝাপড়া করে কঙ্কালের সাথে। আরো দুটো বছর বেঁচে থাকে, শোভার বুকে একটি কচিমুখের মিষ্টি হাসি দেখবার আশায়। জীবন কবির সে সাধ কি পূরবে?

হঠাৎ একদিন শোভা ফিরে আসে। মলিন বেশ, রুক্ষ কেশ, শুষ্ক মুখ! এ কোন্ শোভা? এমন নিরাভরণা কেন সে? কোথায় গেল, রাজকুমারীর ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার? সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্য? জীবনকবি আঁতকে ওঠে। রাজরাণীকে এমন দীনহীন ভিখারিণী সাজিয়ে দিল কে? বিস্মিত কবি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে দলিত ও মথিত পদ্ম-কোরকের মত নিস্প্রভ শোভার মুখের দিকে!

জীবনকবির কঙ্কালসার দেহটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে টেনে তোলে শোভা। কেঁদে কেঁদে বলে—কবি! ওঠো, ওঠো, তোমাকে বাঁচতে হবে! আমাকেও বাঁচাতে হবে। আমি যে ফিরে এসেছি……

—ফিরে এসেছ? জীবনকবির বিস্ময়ের সীমা নেই। কি বলছো শোভা?

—হ্যাঁ, ফিরে এসেছি। বর-বধূর দেনা-পাওনা জন্মের মত চুকিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছি। আমাকে বাঁচাও······

শোভা আর কিছু বল্‌তে পারে না। বহুক্ষণ নীরবে কাঁদে। কবি অস্থির হ'য়ে ওঠে। নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করে—শোভার সীমন্তে সিঁদুর-বিন্দু নেই। নবোঢ়ার শুভ্র ললাট-ফলকের সে বালারুণ-রক্তরাগ এমন নিষ্ঠুরভাবে মুছে দিয়েছে কে? ধীরে ধীরে শোভার অশ্রুসিক্ত পাণ্ডুর মুখখানি বুকের উপর চেপে ধ'রে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে জীবনকবি জিজ্ঞাসা করে—শোভা! যা সন্দেহ করছি—তা কি সত্যি?

—হ্যাঁ সত্যি। শোভা কেঁদে কেঁদে বলে—সে পালিয়ে গেছে আমার নাগালের বাইরে। তাকে তো আর এ জীবনে পাব না আমি······

কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে জীবনকবি যেন এলিয়ে পড়ে। তার বাহুর বাঁধন শিথিল হয়ে যায়। নিদ্রাভিভূতের মত ঢলে পড়তে চায় শোভার কোলে।

—না, না, কবি! তোমাকে বাঁচতেই হবে। আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ওঠো, নাচো, গাও, একতারায় ঝঙ্‌কার তোলো। আমি মরবো না। মরতে পারবো না···

একতারার সুরে বাঁধা—একনিষ্ঠ শোভার পক্ষে বেঁচে-থাকার এ আগ্রহ কেন? জীবনকবির কাছে তা' শুধু দুর্বোধ্য নয়—অস্বাভাবিকও মনে হয়। প্রেমের গভীরতা যেখানে যত বেশী, মৃত্যু-ভীতি সেখানে তত কম। বিয়ের রাতে বরের সাথে, যমের

বাড়ি যেতেও যার শান্ত মনে সাড়া জেগেছিল, তার চঞ্চল মনে বেঁচে-থাকার এ আগ্রহ কেন? জীবনকবি বুঝতে পারে না।

চোখ মুছে, মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়ে শোভা বলে—সে চেয়েছিল—আমার রূপ, আমার স্পর্শ। তা' পেয়েছিল, চাওয়ার আগে—ষোল আনারও বেশী। মনে হয়, সাধ মিটে গেছে, তাই সে পালিয়ে গেছে।

অভিমানিনী শোভা কাঁদে। বিভ্রান্ত কবি সান্ত্বনা দেয়। সদ্য-বিধবার মলিন মুখ ও হতাশ দৃষ্টির দিকে বিস্মিতভাবে চেয়ে কবি ভাবে—বিয়ে কি তবে দেনা-পাওনার দৈহিক সম্বন্ধ? আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন নয়?

হঠাৎ শোভার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভেঙে-পড়া চিন্তাক্লিষ্ট কবির কাঁধটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে—যতই স্বার্থপর সে হোক্—যাবার আগে নিস্বার্থভাবে আমাকে কি দিয়ে গেছে, জানো?

—কি?

—তার স্মৃতি! তার প্রতিচ্ছবি! আমার খোকা। সে-ই যেন শিশু হয়ে ফিরে এসেছে—আমার বুকটাকে লুটেপুটে, আমাকে একেবারে দেউলে করে দিতে······

—তাই নাকি? সে এসেছে? এসেছে······জীবনকবি যেন তড়িৎ-তাড়িতের মত লাফিয়ে ওঠে। উচ্ছ্বসিতভাবে বলে—কাঁচের মানুষ হীরের টুক্‌রো হয়ে ফিরে এসেছে! তবু তুমি এত লোকসানের ভান করছো কেন দিদিমণি?

—আমার কোনো লোকসান হয়নি ?

—নিশ্চয়ই না……ভাঙা একতারাটা কুড়িয়ে নিয়ে জীবন কবি মেরামত করতে বসে। বুকটা তার ফুলে ওঠে। কণ্ঠে জাগে সুর। পায়ের বল ফিরে পায়। গানের তালে নাচতে চায়। নেচে নেচে গায়—

স্বপ্ন আমার সত্যি হলো—
মিথ্যে মরণ-ভয় !
ছিলাম আমি, থাকবো আমি
এ কথা নিশ্চয়।

যেদিন দেবো—একতারা তার হাতে,
চাঁদের আলো আমার আঙিনাতে—
ছড়িয়ে দেবে জীবন—মরণজয়ী !
অসীম ও অক্ষয়।

জীবনকবি কঙ্কালকে ডেকে বলে—ওরে নিষ্ঠুর ! আর দু'চারদিন তোকে শান্ত থাকতেই হবে। কবি এখন মরবে না, মরতে পারবে না। শোভাকে বলে—যাও শোভা ! তাকে নিয়ে এসো। আমি বুকে তুলে নাচবো…

দুঃখিত ভাবে শোভা বলে—খোকা তো এখানে আসবে না কবি ! তোমাকেই যেতে হবে সেখানে…

—আমাকেই যেতে হবে ?

—তা'ছাড়া আর উপায় কি ?

জীবনকবি শূন্য-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শরতের শাদা মেঘ-ছড়ানো আকাশের দিকে। কি যেন ভাবে। হঠাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে বলে—বেশ, তা'হলে তাই হোক! আমাকেই নিয়ে চলো তোমাদের প্রাসাদে···

—তুমি যাবে? শোভা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কবির হাত দু'খানা চেপে ধরে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে—সত্যিই কি তুমি যাবে সেখানে?

—তোমার জন্যে যাইনি। কিন্তু তোমার খোকার জন্যে যাবো। তাকে আমার মনের মত ক'রে গড়ে তুলবো। সেই তো হবে আমার এই একতারার মালিক। আমার গান, আমার সুর, আমার ঝঙ্কার, সবই তো হবে তার! আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে সে। জীবনের শোভা বিকশিত হবে নব-জীবনের দীপ্ত আভায়—চলো, চলো······

—প্রাসাদের অহঙ্কার সইতে পারবে?

জীবনকবি হো হো হেসে ওঠে। হাস্‌তে হাস্‌তে বলে—তোমাদের অহঙ্কার চূর্ণ করতেই তো যাবো সেখানে। মনুষ্যত্বের অবমাননাকারী ঐশ্বর্য্যের উচ্চ-চূড়াকে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবার জন্যে তোমার খোকাই তো হবে আমার এই ক্ষীণ হাতের সর্ব্বচূর্ণ-গদা! বহু গরীব-দুঃখীকে বঞ্চনা ক'রে তোমার বাবা যে-সব ভোগবিলাসের উপকরণ আহরণ করেছেন, তা সবই সে দেবে বিলিয়ে। নিজের বলে কিছু রাখবে না। তোমার মা কে তা জানো?

—কে ?

—আমার স্নেহপুষ্ট পালিতা মেয়ে। একদিন বসুন্ধরা ছিল যার কল্পনা—সেই জীবনকবিকেই আজ সে চিন্‌তে চায় না। তার পরিচয় অস্বীকার করে······

—সে কি কথা ?

—ঐশ্বর্য্যের মাদকতায় এমন আত্মবিস্মৃতি ঘটে। দারিদ্র্যকে ঘৃণা ও উপেক্ষার চোখে না দেখলে ধনাভিমানের প্রতিষ্ঠা হয় না যে······

—আমার খোকা যে ধনাভিমানী রাজকুমার হবে না, তা' তুমি কি করে জান্‌লে ?

—সেই কথাই তো বল্‌ছি। আমি তাকে তৈরি করবো। আমারও নয়, তোমারও নয়—সকলের প্রাণের মানুষ! যে সুরে তোমার সুর বেঁধেছি—সেই সুরে, তার সুরও বাঁধবো। ধনীর মর্য্যাদা কেন বাড়ে তা' জানো ? দরিদ্র তাকে পূজা করে—নিজেকে করে ঘৃণা ও উপেক্ষা! তোমার খোকা হবে নরশ্রেষ্ঠ—নরেশ। সে করবে ধনীদরিদ্র-নির্ব্বিশেষে মনুষ্যত্বের পূজা। তাকে যদি সেভাবে তৈরি করতে না পারি, মিথ্যে আমার এই একতারার কান-মোচ্‌ড়ানো······

বৈধব্যের জ্বালা সইতে না পেরে শোভা ইচ্ছা করেছিল, বিষ খেয়ে মরতে। খোকার মুখের দিকে চেয়ে, ফেলে দিয়েছিল হাতের বিষ! কিন্তু মন তার এখনো বিষিয়ে আছে। বুকের রসও শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টিও হয়ে উঠ্‌ছে—অনাসক্ত,

উদাস! নিমজ্জমানের মতই কবিকে ধরেছে সে ভেসে-ওঠার ক্ষীণ চেষ্টা নিয়ে।

তার খোকা হবে—'নরশ্রেষ্ঠ—নরেশ!' জীবনকবির এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে হঠাৎ শোভার চোখের দীপ্তি ফিরে আসে। আশার আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে—সুমুখের সূচিভেদ্য অন্ধকার। কবি-কল্পিত নরেশের মা হওয়ার লোভে উৎফুল্ল না হয়, এমন মা কি সংসারে আছে? শোভা কি আর মরতে পারে?

অন্যমনস্কভাবে শোভা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা কবি! বল্‌তে পার—মৃত্যুর পর এখন সে আছে কোথায়?

—কোথায় আবার থাক্‌বে? তোমার কাছেই আছে···

শোভা চম্‌কে ওঠে। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে—আমার কাছেই আছে—মানে?

জীবনকবি হেসে বলে—হাতের কঙ্কন ভেঙে গলার হার তৈরি করলে—সোনা তো সোনাই থাকে। তোমার ভালবাসার আতিশয্য সইতে না পেরে সে চেয়েছিল পালাতে। তা' কি পারে? একতারার তার যে কত শক্ত, কত একরোকা, তাতো সে জানে না? তাই ফিরে এসেছে—গলার হার হয়ে বুকে দুল্‌তে। এবার দেখবে সে—কত ভালবাস্‌তে পার তুমি! আজ তার দাবী—তোমার স্নেহ। চাওয়া-পাওয়ার ভালবাসার চেয়ে অযাচিত স্নেহের গভীরতাও বেশী, মধুরতাও বেশী। বরকে যা' দিয়েছিলে—তার প্রতিদানে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল

তোমার মনে। আজ তুমি দেউলে হয়ে শুধুই দেবে। কিছুই চাইবে না, বা পাবে না…

—কেন পাব না? শোভা প্রতিবাদ জানায়। খোকাকে বুকে চেপে ধ'রে আমি যে আনন্দ পাই—তাকি মিথ্যে?

—কেন তা' মিথ্যে হবে? কবি যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। সেই তো সত্যি আনন্দ! সে অনাবিল আনন্দ পাওয়ার জন্যে নয়—দেওয়ার জন্যে। ভোগের জন্যে নয়—ত্যাগের জন্যে। মর্ত্তের নয়, স্বর্গের। খোকা যখন তোমাকে মা বলে ডাকে, তোমার বুকের দুধ উথলে ওঠে। পার তুমি তাকে বাধা দিতে?

জীবনকবি একতারায় ঝঙ্কার দিয়ে নেচে নেচে গায়—

এই কুটিরে ফাগুন দিনের প্রাতে—
বাজ্‌বে আমার একতারা তার হাতে।
ঝঙ্কারে তার নাচবে তরুণ দল,
শঙ্কারে জয় করবে তারা—
বাড়িয়ে মনের বল।
জীবন আমার সেদিন আঁধার রাতে
মিলিয়ে দেব আনন্দময়—সে অক্ষয়
জীবন-স্রোতের সাথে।

রাজকুমারী শোভার মা রাণী-বসুন্ধরা পুত্রহীনা বিধবা। শোভা বিধবা হলেও পুত্রবতী। শোভার পুত্র নরেশ—এই ছুই বিধবার সান্ত্বনা ও শান্তি। একমাত্র বংশধর নরেশ—রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী।

নরেশকে মানুষ গড়বার ভার নিয়েছেন জীবনকবি। বসুন্ধরার আপত্তি ছিল। শোভা ছাড়েনি। জীবনকবিকে টেনে নিয়ে গেছে রাজপ্রাসাদে। কবিব অভিমত—নরেশ শুধু নেচে-গেয়েই মানুষ হবে।

নরেশ দাঁড়াতে শিখলেই কবি তাকে নাচতে শেখালেন। মুখে কথা ফুটলেই সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে শেখালেন। গুরুর হাতের একতারার দিকে শিষ্য খুব নজর রাখে। কখনো বেসুরো গায় না, বা তাল কাটে না। জীবনকবি তার অব্যাহত স্বচ্ছন্দ-গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে। যুক্তি ও তর্কের ভিতর দিয়ে বাক্-চাতুর্য্য শিক্ষা দেয়। নরেশ যেন মূর্ত্তিমান আনন্দ!

বসুন্ধরা বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করেন—এ কি হচ্ছে কবি?

জীবনকবি হেসে বলে—নরেশ মানুষ হচ্ছে—আনন্দময় খাঁটি মানুষ!

ক্রমে নরেশ বড় হয়ে ওঠে। তার কৈশোরকে ছাপিয়ে যৌবন জাগে। এত দিন গুরুও নেচেছেন শিষ্যের সাথে। এখন আর গুরুর পায়ে বল নেই। শিষ্য একাই নাচে! গুরুর

ক্ষীণ কণ্ঠে এখনো জাগে সুর। কিন্তু দম্ আটকায়। সুরের রেশ শিষ্যই রাখে টেনে।

চলনে, বলনে, ও রূপসজ্জায় ধীরে ধীরে নরেশ যেন হয়ে ওঠে জীবনকবির সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব! কবির পাকা চুলের চূড়ার মত—সেও বাঁধে একটি কৃষ্ণ-কালো কাঁচা চুলের চূড়া। রাণী বসুন্ধরার চোখ জ্বলে। শোভার চোখ জুড়ায়।

অসহিষ্ণুভাবে শোভাকে ডেকে বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করেন—বলি, তোর উদ্দেশ্য কি? নরেশ কি রাজকুমার সাজ্‌বে না? পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য নেই, বিলাসিতার দিকে দৃষ্টি নেই, আভিজাত্য সম্বন্ধে হুঁসিয়ারী নেই—এ সব কি হচ্ছে? ওই নোংরা জীবনকবির মত, তোর নরেশও কি শুধু গান গাইবে আর নাচ্‌বে?

শোভা হাসে। বসুন্ধরা রেগে যান। জীবনকবির শিক্ষকতায় রাজকুমার নরেশের এই রুচি-বিকার রাণী বসুন্ধরার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য। দু'দিন বাদে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মালিক হবে সে। ধনসম্পদের প্রতি তার এই অস্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ও আত্মসুখে অমনযোগিতা বসুন্ধরা খুবই অসঙ্গত মনে করেন।

উত্তেজিত বসুন্ধরা একদিন বলেন—না, না, শোভা! এ চল্‌বে না···

—কি চল্‌বে না মা?

—নরেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখাতে হবে। সে শুধু নাচ-গান শিখ্‌বে—এ ব্যবস্থা মান্‌বো না আমি···

—বেশ তো জ্ঞান-বিজ্ঞানও শেখাও। নাচ-গানের সঙ্গে তাদের তো কোন বিরোধ নেই?

—কবিকে তাড়িয়ে দাও···

শোভা চম্‌কে ওঠে। দৃঢ়তার সঙ্গে বলে—না, তা' হতে পারে না মা! কবি আছে, তাই নরেশ আছে। কবি না থাকলে, নরেশও থাকবে না এখানে···

—বলিস্ কি? বসুন্ধরার বিস্ময়ের সীমা নেই। জীবন কবির উপর নরেশের অস্তিত্ব নির্ভর করে? কী ভয়ানক কথা! কবির প্রতি বসুন্ধরার বিদ্বেষ-বুদ্ধি তীব্র হয়ে ওঠে। আচরণও হয়ে ওঠে অত্যন্ত কঠোর।

রাঙা ঠোঁট দু'খানি দিয়ে কুন্দদাঁতের শুভ্র হাসি চেপে, শোভা জিজ্ঞাসা করে—সত্যি বলো তো মা, কবি তোমার কে?

—কেউ নয়, কেউ নয়···রাণী বসুন্ধরা আত্মগোপন চেষ্টায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন। উত্তেজিতভাবে বলেন—আমার ভাগ্যা-কাশের ধূমকেতু! আমার রাজৈশ্বর্য্যের মহিমা-প্রকাশের পথে পাহাড়ের মত বাধা। আমার সুখের পথে কাঁটা!

শোভা গম্ভীর হয়ে যায়। অধোবদনে মনে মনে বলে—ছিছিছি! সুখৈশ্বর্য্যের মোহে তুমি যে কত কুৎসিৎ হয়ে পড়েছ—তাকি বুঝতে পারছ না? কী লজ্জা!

শোভা ডেকে আনে জীবনকবির ভক্তশিষ্য কৌপীনধারী দার্শনিককে। বসুন্ধরা ডেকে আনেন—কোট-প্যাণ্টপরা এক

তরুণ বিজ্ঞানীকে। সকালে দু'ঘণ্টা দার্শনিক আর বিকালে দু'ঘণ্টা বিজ্ঞানী নিলেন নরেশকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান শেখাবার দায়িত্ব। দৈনিক চারঘণ্টা নরেশ বাঁধা পড়ে গেল—জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট পাঠশালায়।

বিজ্ঞানীর হাতে একখণ্ড বেত্রদণ্ড দেখে নরেশ জিজ্ঞাসা করে—ওটা কি সার্?

—বেত!

—বেত কেন? লেখা-পড়ার সঙ্গে বেতের সম্বন্ধ কি?

—আমার নির্দ্দেশমত না-চল্‌লে বা অধ্যয়নে অমনযোগী হলে—তোমাকে এই বেত মারবো।

—বেত মারবেন! নরেশ আঁতকে ওঠে।

—হ্যাঁ···টেবিলে একটা বেত্রাঘাত করে কুঞ্চিত-ভুরু বিজ্ঞানী বলে—তোমার দিদিমার আদেশ!

—দিদিমা বলেছে আমাকে বেত মারতে? বিস্মিতভাবে একবার বেতের দিকে, আর একবার বিজ্ঞানীর মুখের দিকে চায় নরেশ। এও কি সম্ভব? বিশ্বাস করতে পারে না। ব্যথিত ভাবে জিজ্ঞাসা করে—সত্যি—বল্‌ছেন? দিদিমা বলেছে——আমাকে বেত মারতে?

—হ্যাঁ বলেছি—আঁড়াল থেকে সাম্‌নে এসে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন বসুন্ধরা।

—কেন দিদিমা! আমাকে ব্যথা দেবে কেন? তুমি কি আমাকে ভালবাস না? নরেশ কেঁদে ফেলে।

ভর্ৎসনার সুরে বসুন্ধরা বলেন—তুমি উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছ। কতদিন নিষেধ করেছি—ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে মেলা-মেশা ক'রনা। গাছে উঠোনা। নদীতে সাঁতার কেট না। যখন-তখন যেখানে-সেখানে নাচগান করো না…

—কেন? আমি রাজকুমার ব'লে? আমাকে বুঝি সোনার খাঁচায় আট্‌কে রাখতে চাও?

—হ্যাঁ, তুমি একজন কোটিপতির বংশধর। রাজ্যেশ্বর রাজ-চক্রবর্ত্তী! তোমার বংশ-মর্য্যাদা আর আভিজাত্য-বোধ বাড়িয়ে তুলতে হবে। প্রয়োজন হ'লে ওই বিজ্ঞানী তোমাকে বেত মেরে ঢিট্ করবে…

নরেশের মন বিরক্তিতে তিক্ত হয়ে ওঠে। প্রাসাদের মণি-মুক্তার চেয়েও বনাঞ্চলের ফুল ও ফলকে সে বেশী আকর্ষণীয় মনে করে। তার চোখে রাজপুরীর সুখৈশ্বর্য্য কৃত্রিম ও মিথ্যে। প্রকৃতির অফুরন্ত ধনসম্পদের তুলনায় সে কত সামান্য ও সংকীর্ণ! অনন্ত আকাশ-তলেই নরেশ পায় মুক্তির পথ খুঁজে। বিহঙ্গের ডানা দুটিকেই মনে করে স্বাধীনতার প্রতীক।

দার্শনিক বলে—নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখম্। ক্ষুদ্রের বেষ্টনী ভেঙে ভূমার আনন্দে নেচে ওঠে নরেশের প্রাণ। দার্শনিকের শিক্ষা—কবির জীবনাদর্শের পরিপোষক। তাই, ধীরে ধীরে নরেশ হ'য়ে পড়ে—দার্শনিকের অনুরাগী, আর বিজ্ঞানীর প্রতি বিদ্বিষ্ট।

বই হাতে নিয়ে বিজ্ঞানী বলে—পড়ো নরেশ! সূর্য্য পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়…

নরেশ বলে—সে কথা আমি স্বীকার করি না।

—কেন?

—দার্শনিক বলেছেন—আয়তনে বড় হলেই, সে বড় হয় না।

—কাকে বড় বলেন তিনি?

—যে গুণী…

—সূর্য্য কি নির্গুণ?

—তার গুণ সর্ব্বনাশা। যেমন পরশ্রীকাতর, তেমনি প্রভুত্বপ্রিয় তিনি।

—দার্শনিক বলেছে বুঝি?

—আজ্ঞে না। আমি নিজেই বলছি। সূর্য্য কি একটা জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ড নয়? তার এত তেজ কেন? চোখ মেলে তার দিকে তো চাওয়াই যায় না! দূরে আছে, তাই রক্ষে। তবুও মাঝে মাঝে কাছে এসে, পৃথিবীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। তার তাপে পুকুরের জল শুকিয়ে যায়। গাছের পাতা ঝরে পড়ে। একটু দূরে সরে গেলে, তবে আসে বসন্ত! গাছে গাছে ফুল ফোটে—নব-কিশলয়ের ফাঁকে ফাঁকে। মলয়া আসে তাকে দোল দিতে। আমরা দেখতে পাই—পৃথিবীর নয়নানন্দ রূপসজ্জা!

একটু হেসে বিজ্ঞানী বলে—তোমার ধারণা ভুল। গ্রীষ্মের

তাপে পৃথিবী শুকিয়ে ওঠে সত্যি। আবার বর্ষা এসে তাকে ভিজিয়ে সরস করে। শরৎ আর হেমন্ত না এলে, শীত ও বসন্তের শুভাগমন হতো না। সূর্য্যই এ ঋতু-চক্রের অধিপতি।

—তার আধিপত্যই যে আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই…

—সর্ব্বনাশটা কিসে হ'লো? কাকে তুমি সর্ব্বনাশ বলছো? বোঝাতে পার?

—কবি বলেছেন—প্রতিপদ থেকে চাঁদকে তিনি ঢাকতে সুরু করেন। অমাবস্যায় সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেন। এত নীচতা কেন তার?

—নীচতা?

—হ্যাঁ নীচতা। এ আধিপত্যের প্রবৃত্তিকে নীচতা ছাড়া আর-কিছু বলা চলে না। বারো মাস পূর্ণিমা থাকলে—আমাদের কি ক্ষতিটা হ'তো, শুনি? চাঁদ আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি…

উত্তেজিতভাবে টেবিলে একটা বেত্রাঘাত ক'রে বিজ্ঞানী বলে—একেবারেই অবৈজ্ঞানিক! পাগলের প্রলাপ! কবি তোমাকে ভুল বুঝিয়েছেন। সূর্য্যরশ্মি আছে বলেই আমাদের জীবন-ধারণ সম্ভব হচ্ছে।

—কখ্খনো না। নরেশের প্রতিবাদ তীব্র হয়ে ওঠে। সে বলে—ধরুন, সূর্য্য নেই। দিনটা হলো রাত্তির। রাত্তিরে পেলাম—অফুরন্ত জ্যোছনা।. কত শান্ত, কত স্নিগ্ধ সে আলো।

শুধু চাঁদ থাকলে, পৃথিবী কি সুন্দর হতো বলুন তো ? কত ঠাণ্ডা থাকতো জগতের আবহাওয়া ! দিদিমার মাথাটাও গরম হয়ে উঠতো না। আপনিও আমাকে পড়াতে বসতেন না, একগাছা বেত হাতে নিয়ে…

বিজ্ঞানী হো হো করে হাসে। নরেশ মনে করে—সে একটা মুর্খের হাসি ! বেকুবের হাসি ! নিজের যুক্তি ও তর্ক অকাট্য প্রমাণের জন্যে সোৎসাহে বলে—কবি কি বলেছেন, শুনবেন ?

—কি ? বলো তো…

—মানুষের মনে সব রকম দুস্প্রবৃত্তি ও দূরাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলার একমাত্র কারণ হচ্ছে—ওই সূর্য্য-তেজ ! চাঁদের আলো আছে—তাই পৃথিবীতে আছে মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি, স্নেহ, দয়া, ও মায়া।

উত্তেজিত বিজ্ঞানী বলে—তোমার কবিও যেমন হস্তীমূর্খ, তোমাকেও তৈরি করেছেন—তেমনি একটি চৌকোষ গর্দ্দভ !

—আপনার বিজ্ঞান-বুদ্ধি কি কবির সে অভিমত স্বীকার করে না ?

—নিশ্চয়ই না। চাঁদের আলো যে জ্যোছনা, তাও তার নিজস্ব নয়। গলবস্ত্রে ভিক্ষার্থী হয়ে সূর্য্যের কাছ থেকে ধার করা।

—তাই নাকি ? তাহলে সূর্য্য কি আমার সেই দাদামশাই ?

—কোন্ দাদামশাই ? বিজ্ঞানী জিজ্ঞাসু ভাবে চেয়ে থাকে নরেশের মুখের দিকে।

হাসতে হাসতে নরেশ বলে—যে দাদামশাই রাজা ছিলেন। গরীবের মেয়ে সুন্দরী-দিদিমাকে রাণী সাজিয়েছিলেন। কবির কাছে শুনেছি—তিনি নাকি টাকা ধার দিতেন। সুদের সুদ আদায় করতেন। গরীবকে বঞ্চনা করে, তাদের সর্ব্বস্ব লুটে-পুটে এনে তৈরি করেছিলেন এই রাজপ্রাসাদ! নিশ্চয়ই আমার দাদামশাই ছিলেন সূর্য্যঠাকুরের নাতি। মার কাছেও শুনেছি—তিনি নাকি সূর্য্যবংশের মেয়ে!

কথাগুলি হজম করতে না পেরে, বিজ্ঞানী বিস্মিত ভাবে চেয়ে থাকে নরেশের মুখের দিকে।

নরেশ বলে—সূর্য্য আলো ধার দেন। সুদ আদায় করেন—অমাবস্যার অন্ধকারে। তাই তো চাঁদের দারিদ্র্য ঘোচে না? তার চেয়ে চাঁদকে তিনি মুক্তি দিন না? কিছু আলো তার নিজস্ব হয়ে যাক। আমরাও চাঁদের আলোয় নেচে-গেয়ে সুখে থাকি। সূর্য্য-তেজের এত আধিপত্য কেন? সূর্য্যের তাপে পৃথিবীর বালিও বেজায় তাতে। দূরের সূর্য্যকে তবুও সহ্য করা যায়, নিকটের তাতা-বালি একেবারেই অসহ্য!

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে টেবিলে একটা বেত্রাঘাত করে বিজ্ঞানী উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে—কাব্যানুরাগে শুধু চাঁদের আলোয় বাঁচতে হলে—পৃথিবীর সব লোক মরে যাবে 'থাইসিসে'! একতারার ঝঙ্কারে থাইসিস্ সারবে না…

বসুন্ধরা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করেন—কি হয়েছে? চেঁচাচ্ছ কেন?

—আপনার নাতিকে বিজ্ঞান শেখানো, আমার মত একজন ডক্‌টর-অব্‌-সায়েন্সের পক্ষেও সম্ভব নয়···গর্ব্বিতভাবে বিজ্ঞানী বলে।

—কেন ?

—কবি-গুরু ওর মাথাটা খেয়ে বসে আছেন। যত আজ-গুবি ধ্যান-ধারণা ইন্‌জেক্‌সান্‌ করেছেন ওর তুলতুলে মগজে···

জীবনকবি ছিল আঁড়ালে দাঁড়িয়ে। বয়সেব ভাবে তার মেরুদণ্ড ভেঙে কুব্জ হ'য়ে পড়েছে। সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে-পড়া দেহটাকে সোজা রাখবার জন্যে দবকার হয়েছে—তৃতীয় পা। সেও একটা কুদৃশ্য—মোটা ও ত্রিভঙ্গ পাহাড়ী-বেতের লাঠি !

নিতান্ত অপরাধীর মত কবজোড়ে, অষ্টাবক্রের ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে জীবনকবি বলে—রাণীমা ! তা'হলে আমি এখন আসি ?

অধোবদনে মেঝেব দিকে চেয়ে বসুন্ধরা বলেন—এসো—তোমাকে আর সহ্য কবতে পারছিনে—এ কথা সত্যি···

শোভা ছুটে এসে বাধা দেয়—না, না, কবি কেন যাবে ?

জীবনকবি একটু হেসে বলে—আমার কাজও ফুরিয়েছে—আমিও ফুরিয়েছি। আর কেন দিদিমণি ? এখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে—বিজ্ঞানী আর দার্শনিকেব লড়াই দেখি···

—না, না, তুমি যেয়ো না···শোভা অস্থিরতা প্রকাশ করে।

বসুন্ধরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। গম্ভীর স্বরে ডাকেন—শোভা !

—কি মা ?

—কবিকে যেতে দাও…

—কেন ? কেন তুমি কবিকে তাড়িয়ে দিচ্ছ ? তীব্র প্রতিবাদের সুরে শোভা জিজ্ঞাসা করে।

শোভা জানে—অন্ন-বস্ত্রের মতই নৃত্যগীত নরেশের জীবন-ধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। কবি চলে গেলে—নরেশের নাচগান বন্ধ হয়ে যাবে। সে বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌বে। তাই সে ভয় করে—সদানন্দ নরেশও থাকবে না এখানে। বসুন্ধরা তাকে বেঁধে রাখতেও পারবেন না। দিনান্তে নরেশের মুখখানি দেখ্‌তে না পেলে—শোভা বাঁচ্‌বে কি করে ? অনুনয়ের সুরে বলে—মা ! তোমার পায়ে পড়ি—আমার সর্ব্বনাশ করো না ··

—কবি চলে গেলে তোমার সর্ব্বনাশ হবে ?

—হ্যাঁ, হবে। নরেশও থাকবে না এখানে।

—আমি তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখ্‌বো…

জীবনকবি হাসে। উত্তেজিতভাবে বসুন্ধরা বলেন—ওই দুষমণ-কবির কুশিক্ষা নরেশকে চরম উচ্ছৃঙ্খল গড়ে তুলেছে। ওকে আর সহ্য করবো না আমি। সে-দিন নরেশ কি করেছে —জানো ?

—কি ?

—একজন দেনাদার এসেছিল—সুদের টাকা পরিশোধ করতে। শুনলাম ম্যানেজারের হাত থেকে খৎ খানা কেড়ে নিয়ে

—নরেশ নাকি টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলেছে। দেনা-দারকে বলে দিয়েছে—আসল টাকাও দিতে হবে না···

উৎফুল্লভাবে শোভার কোলের কাছে এগিয়ে এসে নরেশ বলে—আর একটা কাজ কি করেছি, জানো মা ?

—আবার কি করেছ ? শোভা জিজ্ঞাসা করে।

নরেশ বলে—এই পৌষের শীতে বুড়ো দেনাদার ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল। তার গায়ে একখানা ছেঁড়া গামছা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি দৌড়ে গিয়ে দিদিমার শালের জোড়া এনে তাকে জড়িয়ে দিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলাম গেট পর্য্যন্ত···

—তাই নাকি ? তাই নাকি ? আনন্দে আত্মহারা জীবনকবি নেচে ওঠে। একতারায় ঝঙ্‌কার দিয়ে গেয়ে ওঠে—

কে জানে মোর চারা-গাছে
ধরবে এ ফল অকালে ?
সুয্যিঠাকুর অস্তে গেলেন—
উঠ্‌লো কি চাঁদ সকালে ?
চলন-পথে একলা চলি,
মনের কথা হাওয়ায় বলি—
সবাই হলো সুখী, বিধি !
আমায় শুধু ঠকালে ?

চোখ রাঙিয়ে বসুন্ধরা ধমক দেন—অসভ্য ! থামো···

—কেন থাম্‌বেন ? প্রতিবাদ জানিয়ে উত্তেজিত ভাবে নরেশ বলে—গাও কবি ! আমি নাচ্‌বো···

—না ! এ প্রাসাদে আর নাচগান চল্‌বে না। যাও তুমি —এখুনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমার আদেশ·· বসুন্ধরা আগুন হয়ে ওঠেন।

শীতল জল হ'য়ে একটু হেসে নরেশ বলে—আচ্ছা দিদিমা ! আয়তনে বড় হওয়াই কি সত্যি বড় হওয়া ?

—তার মানে ? বসুন্ধরা খুব গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করেন।

—মা সেদিন বলছিল—তোমার ওজন নাকি দু'মন ছত্রিশ সের ! দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিক দুজনকেই যদি দাঁড়িপাল্লায় তোলা যায়—তবু তারা তোমার সমান হবে কিনা—সন্দেহ।

—তাতে কি হয়েছে ?

নরেশ একটু হেসে বলে—তুমিই তো পারবে আমাকে শিখিয়ে দিতে—কি ভাবে গরীবের টাকা কেড়ে নিয়ে ঘী-দুধ খেতে হয়, আর মুটিয়ে যেতে হয়। ওদের আর কি দরকার ? কবির সঙ্গে ওদের দুজনকেও তাড়িয়ে দাও···

নরেশের এই মারাত্মক মন্তব্য শুনে জীবনকবি চম্‌কে ওঠে। ধনগর্ব্বিতা বসুন্ধরাকে বিঁধবার জন্যে নরেশের তূণে আর কত বাণ আছে—তাই বা কে জানে ? না, না, এখানে আর নয়। নাচ-গানের দুধ-কলায় নরেশের কচি দাঁতে অতি উগ্র বিষ জমেছে। সে বিষ বসুন্ধরাকে জর্জ্জরিত করবেই।

উপায় নেই। বুকভরা আত্মপ্রসাদ নিয়ে জীবনকবি চলে যায় নিজের কুটিরে। শোভার বাধা মানে না। মনে মনে বলে যায়—বেঁচে থাকো নরেশ! বেঁচে থাকো। কোটি-কোটি বছর হোক তোমার পরমায়ু!

পথে যেতে যেতে দার্শনিক জিজ্ঞাসা করে—গুরুদেব! আপনার মনে এত হিংসা?

—কে বলেছে—আমি অহিংস? হিংসা মানুষের পেটে জমে ওঠে মায়ের দুধের সঙ্গে।

—তবে আমাকে অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন কেন?

—যেহেতু তুমিও হিংস্র! হিংসা তো মানুষের রক্তে ও মাংসে জড়িয়ে আছে? তাকে পাবার জন্যে কোনো চেষ্টাই করতে হয় না। অহিংসাই সাধন-সাপেক্ষ। সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার উপায়। হিংস্র মানুষকে অহিংস হবার জন্যে সাধনা করতে হয়। সেই কারণেই দীক্ষার প্রয়োজন আছে।

—সত্যিই কি বসুন্ধরা আপনার মেয়ে?

জীবনকবি হেসে বলে—আমি তো বিয়েই করিনি। আমার একটা মেয়ে আস্‌বে কোথেকে? তবে সে আমার মেয়ের চেয়েও বেশী ছিল একদিন।

—তার মানে?

—মা বাপ-হারা একটি ছোট্ট মেয়ে! ফ্যান্ দাও মা! ফ্যান্ দাও মা! ব'লে পথে পথে কেঁদে বেড়াতো। কোলে তুলে নিয়েছিলাম। মানুষ করেছিলাম। বয়সের দিনে

বড়লোকের নজরে পড়লো। আমাকে গেল একেবারেই ভুলে —জীবনকবির চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে যায়।

কুটিরে পৌঁছে জীবনকবি দেখে—তার পরিচ্ছন্ন কুটিরখানি যেমন ছিল, ঠিক তেমনি আছে। চাষী বালক-বালিকারা কল-হাস্যে কুটিরপ্রাঙ্গণ মুখরিত করে রেখেছে। গাছে গাছে ফুলও ফুটেছে, ফলও ধরেছে।

পরিশ্রান্ত জীবনকবি কুটিরের দাওয়ায় গিয়ে বসে। দার্শনিক গিয়ে বসে তার পদপ্রান্তে।

জীবনকবি বলে—পরার্থবুদ্ধি দেশদরদী তুমি। আমার বুদ্ধি পরমার্থ। তাই একটু স্বার্থপর আমি। আমার মত পরমানন্দ-লোভী তো তুমি নও? তাই তোমার পথও আমার নয়। আমার মতও তোমার নয়। হিংসার পথেও আমি অক্ষত বেরিয়ে যাব। তোমার হবে ক্ষতি। তাই তোমাকে হতে হবে অহিংস সত্যাগ্রহী! আমার কাব্য-জীবনে সত্যের সঙ্গে মিথ্যা জড়ানো। তা'তো জানো?

দার্শনিক বলে—এই যে সে-দিন বল্‌লেন—মিথ্যাকে আপনি ঘৃণা করেন?

—হ্যাঁ, তা' করি বৈ কি। কিন্তু, যাকে ঘৃণা করি তাকে তো ফেলে দিই না? মিথ্যাকে আমি কল্পনার কারুকার্য্যে এমনভাবে সাজাই যে—সে আর তখন মিথ্যা থাকে না। সত্যির চেয়েও সত্যি হয়ে ওঠে! আসল কথা কি জানো?

—কি বলুন তো ?

জীবনকবি হেসে বলে—অহঙ্কার না-থাকলে—সত্য-মিথ্যার বিচারও থাকতো না। যে সত্যি, সেই মিথ্যে। মূলে তো সবই এক…

দার্শনিক অবিশ্বাসীর চোখে চেয়ে থাকে কবির মুখের দিকে। হাসতে হাসতে একতারা বাজিয়ে জীবনকবি গায়—

মিথ্যা আমার মন-যমুনা,
সত্যি শ্যামের বাঁশী !
বসুন্ধরার মিথ্যা দাবী—
সত্যি শোভার হাসি।
সেই হাসি আর বাঁশীর সুরে
আমার এ গান জগৎ জুড়ে—
তুল্‌বে যখন হাজার প্রাণের সাড়া !
ওরে ! কেউ কি তখন থাকবে—ওরে !
অলস—অবিশ্বাসী ?

রাগে বসুন্ধরার চোখ-মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। ওই' একরত্তি ছেলে নরেশ তাকে করে--ঘী-দুধ খাওয়ার পরিহাস? রাণীর ওজন দু'মন ছত্রিশ সের না হয়ে, তিন মন—তেত্রিশ সের—তিন ছটাক হলেই বা ক্ষতিটা ছিল কি? শোভা তার সামনে মাথা তুলে কথা বলতে সাহস করে না। তার ছেলে নরেশ! সে করে রাণী-বসুন্ধরাকে অসম্মান? নরেশকে শায়েস্তা করতেই হবে।

বিজ্ঞানীর হাত থেকে বেতখানা টেনে নিয়ে বসুন্ধরা বলেন—এই বেত হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। তুমি পড়াও ওকে…

—পড়ো নরেশ! বিজ্ঞানী চেয়ার পেতে বসে। নরেশ ভয়ে ভয়ে বসে একটা টুলের উপর।

বিজ্ঞানী বলে—পড়ো—উত্তর-মেরুতে ছ'মাস দিন, আর ছ'মাস রাত্তির!

নরেশ বলে—সেখানে বোধ হয় ছ'মাস থাইসিস্ আর ছ'মাস কলেরা?

—আঃ! বাজে ব'কো না…

—বারে! আপনিই তো বললেন—যেখানে সূর্য্যরশ্মি নেই, সেখানে আছে থাইসিস্!

বিরক্ত বিজ্ঞানী বইখানা টেবিলের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে—খাতা পেন্‌সিল নাও—আঁকো কষো…

বসুন্ধরা বলেন—হাঁ ঠিক। আঁক্ কষাও। টাকা—আনা পাইয়ের হিসাব শেখাও। আমি একটু ঘুরে আসছি…

বসুন্ধরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে, নরেশ যেন হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচে। আড়াই-মনের বেশী দিদিমার হাতে বেত দেখলে কোন্ নাতির পিলে না চম্‌কায়

একটু নড়েচড়ে বসে নরেশ বলে—শুনুন্ সার! আঁকগুলো যেন পচা নর্দ্দমার পোকার মত আমার মাথার ভিতর ঢুকে কিল্‌বিল্ করে। তার চেয়ে গুন্ গুন্ করে একটা গান গাই শুনুন…

—রাণী বসুন্ধরা আমাকে মাইনে দিচ্ছেন—তোমাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে। তোমার গান তারিফ্ করবার জন্যে নয়…বলেই বিজ্ঞানী তার প্যাণ্টের পকেট থেকে সিগারেট কেস্‌টা বের করে। ক্ষুদ্র একটি চক্‌মকি-বাতি জ্বেলে একটা সিগারেটও ধরায়।

নরেশ বলে—আমাকেও একটা দিন্ না সার।

—তুমি সিগারেট খাবে ?

—দোষ কি ?

—সিগারেট খেলে লাঙস্ খারাপ হয়।

—আপনার লাঙস্ নেই ?

—বড্ড অসভ্য তুমি…

—বারে ! সিগারেট খাচ্ছেন আপনি, আর অসভ্য হচ্ছি আমি···

জানলা-পথে বিজ্ঞানী দেখতে পায়—বসুন্ধরা আসছেন। চকিতে সদ্য-ধরানো—সিগারেট্‌টা জুতোর তলায় মাড়িয়ে ধরে সে। একটু হেসে নরেশ বলে—আমার পায়েও খড়ম আছে সার্! আমিও ওভাবে লুকোতে পারতাম···

বসুন্ধরা এসে জিজ্ঞাসা করেন—কি হচ্ছে ?

বিজ্ঞানী হতাশভাবে বলে—নরেশ আঁক কষতেও রাজী নয়···

চোখ রাঙিয়ে বসুন্ধরা কৈফিয়ৎ তলব করেন—কেন নরেশ ?

যন্ত্রণার অভিনয় দেখিয়ে নরেশ বলে—বড্ড পেট-ব্যথা করছে দিদিমা !

—পেট-ব্যথা করছে ? বসুন্ধরা শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন—থাক্ থাক্, তা'হলে আজ আর পড়াশুনার দরকার নেই। ওষুধ খাবে এস···বলেই বসুন্ধরা কক্ষান্তরে প্রবেশ করেন।

নরেশ ভাবে—তাই তো ! পিঠ বাঁচিয়েছি, পেটের দোহাই দিয়ে। এখন পেট বাঁচাবার উপায় কি ? হয় বেত, আর না হয় তেতো ওষুধ। একটার কাছে মাথা নোয়াতেই হবে।

সকালে দার্শনিক বলেছেন—কখ্‌খনো মিছে কথা বলো না। বিকালে বৈজ্ঞানিকের বেত সেই মিছে কথা না বলিয়েই ছাড়লো না। নরেশ ছুটে যায় শোভার কাছে। তাকে জড়িয়ে

ধরে কেঁদে কেঁদে বলে—মা! আমি মিছে কথা বলেছি। সত্যি পেট-ব্যথা করছে না আমার। তবু দিদিমা আমাকে তেতো ওষুধ গেলাবে···

—কেন মিছে কথা বললে?

—সত্যি বল্‌লে বেত মারতো।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আজই আমি পালিয়ে যাই কবির কাছে। কি বলো? যেখানে সত্যির শাস্তি বেত, আর মিথ্যের শাস্তি তেতো ওষুধ! সেখানে থাকবো কি করে?

শোভার চোখ দু'টি জলে ভরে ওঠে। চোখ মুছে নরেশের মাথায় হাত রেখে অসঙ্কোচে বলে—এসো বাবা! এখানে আর থেকো না তুমি···

—যাবো?

—হ্যাঁ, যাও। এখানে থাক্‌লে তুমি মিথ্যাবাদী হবে, চোর হবে, ডাকাত হবে···

—তুমি কাঁদ্‌বে না আমার জন্যে?

—চোর-ডাকাতের মাকে তো সারা জীবনটাই কেঁদে কাটাতে হবে? তার চেয়ে কবির কাছেই যাও তুমি। আমি গিয়ে মাঝে মাঝে দেখে আস্‌বো। চোখে জল এলেও, মুছ্‌তে পারবো।

দার্শনিক এসে শোভার এ প্রস্তাব সমর্থন করে। নরেশের হাতখানা ধরে বলে—গুরুদেবের কাছেই চলো তুমি। শিক্ষনীয়

বিষয়ের চেয়েও শিক্ষার পরিবেশ বেশী মূল্যবান। খাঁচায় আট্‌কে রেখে, পাখীকে কি উড়তে শেখানো যায়? ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে মহত্ত্ব ও উদারতার শিক্ষা আকাশ-কুসুম! ধনাভিমান সুশিক্ষার পরিপন্থী।

শোভার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে, নরেশ উঠে দাঁড়ায়। সজল চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে—শোভা তাকিয়ে থাকে নরেশের অনিন্দ্য-সুন্দর মুখের দিকে। মুখাবয়বের তরুণ লাবণ্য তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—সেই পেয়ে-হারানো—প্রেমাস্পদের মুখচ্ছবি! মনে পড়ে অতীতের কত সুখস্মৃতি। ধীরে ধীরে কিশোর-নরেশকে শোভা টেনে নেয় নিজের বুকের মধ্যে। ভিজিয়ে দেয় তার মোহনচূড়া অবাধ্য অশ্রুধারায়। দুইটি স্নেহার্ত্ত চুম্বন এঁকে দেয় তার ললাটে আর ঊষার মত রক্তাভ স্নিগ্ধ গণ্ডে।

নরেশ চোখ মুছে চলে যায়—দার্শনিকের সঙ্গে।

এক হাতে ওষুধ ও আর-এক হাতে বেত নিয়ে, বসুন্ধরা এসে জিজ্ঞাসা করেন—নরেশ কই?

—চলে গেছে···

—কোথায়?

—কবির কুটিরে···

—তোমাকে বলে গেছে?

—হ্যাঁ।

—বাধা দাও নি?

—না।

—কেন ?

—কবিই তার আপন-জন। আমি কেউ নই। এখানে সে থাকবে না।

—সে কথার মানে ?

—মানে তোমাকে বোঝাতে পারবো না মা! নরেশের আশা ছেড়ে দাও…

—আশা ছেড়ে দেব ?

—হ্যাঁ।

—বটে ? অস্থির ভাবে বসুন্ধরা একটা জান্‌লার ধারে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকেন। ওষুধটা ফেলে দেন। বাঁ-হাতের বেত দিয়ে ডান-হাতটাকে সজোরে দু'চারটে আঘাত করেন। হঠাৎ শোভার সাম্‌নে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—শোন শোভা! তোমাকে আবার বিয়ে দেব আমি…

শোভা চম্‌কে ওঠে। কী ভয়ানক কথা! দারুণ বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখ দু'টি মেলে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে সে বসুন্ধরার গম্ভীর মুখের দিকে। বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি বল্‌ছো মা ?

—তোমার এ অকাল-বৈধব্য আমি অসঙ্গত মনে করি। পূরো দু'টি বছরও স্বামীকে নিয়ে সুখী হওনি তুমি। আবার

তোমাকে বিয়ে দেব—আমার এ সঙ্কল্প স্থির। আমি পাত্র দেখ্ছি…

—পাত্র দেখ্ছো? হঠাৎ শোভা হেসে ফেলে। হাস্তে হাস্তে গড়িয়ে পড়ে একটা ভেল্ভেটে-ঢাকা সোফার উপর। সারা ঘরে যেন ছড়িয়ে পড়ে এক রাশ শুভ্র শেফালী। বসুন্ধরা অত্যন্ত বিরক্তি-বোধ করেন। রেগে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

পরের দিন। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক—দুজনকেই বসুন্ধরা ডেকে পাঠান। একটা ছোট গোলটেবিল ঘিরে বসেন তাদের নিয়ে। টেবিলের উপর চা ও খাবার আসে।

বসুন্ধরা জান্তে চান—বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তোমাদের মতামত কি?

সকলের অলক্ষ্যে শোভা থাকে আঁড়ালে দাঁড়িয়ে। উৎকণ্ঠিতভাবে শোনে তাদের আলাপ-আলোচনা।

দার্শনিক বলে—বৈধব্য বাইরের কিছু নয়। মনের একটা অবস্থা-বিশেষ। যার মন বিধবা হয়নি, তার বৈধব্যপালন যে ঘৃণ্য-মিথ্যাচার, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যার মন বিধবা হয়েছে—গত স্বামীর পবিত্র স্মৃতিকে যে মুছে ফেল্তে পারছে না, বিধবা-বিবাহের উৎসাহ নিয়ে, তার মনের উপর অত্যাচার চালানোর চেষ্টা সমাজের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

বিজ্ঞানী সে কথা স্বীকার করে না। সে বলে—মা-হওয়ায় সম্ভাবনা যার আছে, যে-কোনো অবস্থাতেই তার বৈধব্য-পালন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, অস্বাভাবিক ও অসঙ্গতিপূর্ণ। তুমুল তর্ক বেধে

যায়। দার্শনিক দেয় মনের প্রাধান্য—বৈজ্ঞানিক দেয় দেহের। কোনো মীমাংসায় পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে ওঠে।

যে-কোন বিবাহই একটা সামাজিক প্রয়োজন। ভালবাসা বা মন্দবাসার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ আছে—একথা বিজ্ঞানী স্বীকার করে না। প্রেমবর্জ্জিত বিবাহকে দার্শনিক বলে পশু-ধর্ম্মী। একমাত্র যৌন-চেতনাই পবিত্র বিবাহ প্রথার মূল বিবেচিত হলে—মানব-সভ্যতার দাবী ক্ষুন্ন হতে বাধ্য। বিজ্ঞানী সে যুক্তি হেসে উড়িয়ে দেয়। প্রয়োজন-বোধে বসুন্ধরাও করেন সে হাসিতে যোগদান। দার্শনিকের যুক্তি ও তর্ক নিষ্পেষিত হয়ে যায়—বিরাট-দেহী রাণী-বসুন্ধরার ঘটোৎকচ-চাপে। শেষ-পর্য্যন্ত ঘোষণা করা হয়—বস্তু বিজ্ঞানের অবিসংবাদিত জয়। অলক্ষ্য-অদৃষ্টের মত আঁড়ালে দাঁড়িয়ে শোভা হাসে।

প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নরেশের শিক্ষকতা হলেও—সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান বিজ্ঞানীর লুব্ধদৃষ্টি পড়েছে পটে-আঁকা ছবির মত অনিন্দ্য-সুন্দরী শোভার প্রতি। শোভা তা' জেনে ফেলেছে। মেয়েদের সন্ধানী-চোখে পুরুষের দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে—তার নিজের কাছে ধরা-পড়ারও অনেক আগে। পুরুষের পাদক্ষেপ এত চঞ্চল যে, হোঁচট্ না-খাওয়া পর্য্যন্ত সে বুঝতেই পারে না—পথ কত বন্ধুর! মেয়েদের কাছে বেসামাল-পুরুষ তার চোখের পাতা দিয়ে চোখ দু'টি ঢাকতে পারে, কিন্তু মন ঢাকতে পারে না। মনস্তত্ত্বের এ অধ্যায় বিজ্ঞানীর অজ্ঞাত।

বিজ্ঞানীর মতে—যে কোন ক্ষুধা দৈহিক অভাব-পূরণের

একটা আগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। মন-কেন্দ্রিক রসবোধ সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। বস্তু-বিজ্ঞানের বাইরে যে কিছু আছে, একথা সে মানতে চায় না। তর্কের খাতিরে মান্‌লেও—তা' নিয়ে মাথা ঘামায় না।

দার্শনিক বলে—একদিন হয়তো তোমরা এমন দু'চারটে ভাইটামিন-পিল আবিস্কার করবে—যা' উদরস্থ হ'লে—দৈহিক অভাব-পূরণ-সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু সুরস পায়স দেখলে রসনা যেরূপ রসিক হ'য়ে ওঠে, তোমাদের ভাইটামিন পিলের মধ্যে কি সে আকর্ষণ থাকবে?

বিজ্ঞানী বলে—নাই বা থাকলো, বেঁচে থাকার সমস্যাটাই আসল।

দার্শনিক বলে—নাই বা—বাঁচলাম, অরসিক নিরানন্দ-জীবনকে রবারের মত টেনে বাড়ানোর প্রয়োজন কি?

এ তর্কযুদ্ধের শেষ-মীমাংসা হয় বসুন্ধরার তুরুপের তাসে। না-বুঝেও তিনি বিজ্ঞানীর পক্ষ-সমর্থন করেন—গোয়ালার ঢিল-বওয়ার মত নিজের প্রয়োজনের দিকে চেয়ে। এ-রহস্যের নায়িকা শোভা অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে তখনো নিঃশব্দে হাসে। কে জানে—তার হাসি কার যুক্তি ও তর্কের সমর্থক?

অতি সঙ্গোপনে, শোভার অসাক্ষাতে বসুন্ধরা একদিন বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি কি রাজী আছ শোভাকে বিয়ে করতে? বলো—তা'হলে অবিলম্বেই ব্যবস্থা করি...

বিজ্ঞানী বিব্রত হয়ে পড়ে। এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের

জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তবু নিজের কাছে ধরা পড়ে যায় নিজের দুর্ব্বলতা। অতি অকস্মাৎ জেগে ওঠে প্রচণ্ড ক্ষুধা। আকণ্ঠ তৃষ্ণায় গলা যেন শুকিয়ে ওঠে। ভাইটামিন-পিলের চেয়েও সুরস পায়স যে বেশী লোভনীয়—সে তত্ত্ব মনে মনে স্বীকার করে। তবু বসুন্ধরার প্রশ্নের জবাব দিতে কণ্ঠস্বর যায় কেঁপে। থেমে থেমে ঢোক্ গিলে বলে—আমি—কি—তাঁর…

—যোগ্যাযোগ্যের বিচার-ভার আমাব উপরেই থাক। তুমি রাজী আছ কি না, বলো? একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গুণী ও জ্ঞানী তুমি। শোভা আমার মেয়ে। তোমার আপত্তি না থাকলে এ বিবাহে কোন বাধা নেই…

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী শোভা। শোভাকে পাওয়া, মানে রাজরাজেশ্বর হওয়া। এ হিসাবের দিকেও বিজ্ঞানীর নজর পড়ে। আগ্রহ বেড়ে যায়। বিজ্ঞানী অধৈর্য্য হয়ে ওঠে। কিন্তু শোভার মনের খবর কি? বিজ্ঞানী নানাভাবে চেষ্টা করে শোভাকে জানতে ও বুঝতে।

মনে মনে অত্যন্ত বিরক্তি-বোধ করলেও, লুব্ধ বিজ্ঞানীকে একটু যাচাই করবার কৌতুহল, অভিনেত্রী শোভা সম্বরণ করতে পারে না। হাস্যে ও লাস্যে তাকে নাচায় ও নিজে আনন্দ পায়। বসুন্ধরাও উৎসাহিত হ'য়ে ওঠেন। একদিন তিনি একান্তে শোভাকে জিজ্ঞাসা করেন—দিন ঠিক করবো?

শোভা কেঁদে ফেলে। চোখ মুছে বলে—মা! আমি শুধু ভাবছি—তুমি কি? অন্য কোন কথা না বলেই ঘর থেকে

বেরিয়ে যায় সে। নরেশের মুখখানি মনে পড়লেই শোভার চোখ থেকে অশ্রু গড়ায়। হাস্য-পরিহাসের আঁড়ালে তার অন্তরে যে আগ্নেয়গিরি ধূমায়িত হয়, সে খবর কেউ রাখে না। তবু বাইরে সে কত শান্ত ও সংযত! কত মৃদু ও মধুর।

একদিন চায়ের টেবিলে বসে বিজ্ঞানী তার পুঁথিগত ক্ষুধা ও তৃষ্ণার ব্যাখ্যা সুরু করে। খাদ্যের প্রয়োজন ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে, আর ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজন দেহরক্ষার জন্যে!

একটু হেসে শোভা জিজ্ঞাসা করে—'দেহরক্ষা' কথাটার মানে—জানেন?

—কি? বলুন তো…

—মৃত্যু! তাহলে কি বুঝবো—বিজ্ঞানীদের মতে মৃত্যুই ক্ষুধিতের কাম্য?

—না, না, তা' কেন হবে। বহুবিধ সুখ-সমৃদ্ধির ভিতর দিয়ে, মানুষকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই। তাদের পরমায়ু বৃদ্ধি করতে চাই…

—কি করতে চান, আর কি করেছেন, সে হিসাব-নিকাশের সময় কি এখনো আসেনি? জীবনকবি বলেন—এ যুগের যান্ত্রিক-সভ্যতা মানুষকে ধ্বংসের পথে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে। বাইরের সম্পদবৃদ্ধির ফলে, মানুষের অন্তরের দৈন্য অসম্ভব বেড়ে উঠেছে। বাঁচিয়ে রাখবার ভান দেখিয়ে—মেরে ফেলবার বহু পন্থা আবিস্কৃত হয়েছে। আপনি কি বলতে চান—কবির এ অভিমত ভুল?

—নিশ্চয়ই। টেবিলে একটা কিল্ দিয়ে বিজ্ঞানী সদম্ভে বলে—নানা বিষয়ের সংখ্যাতত্ত্ব দাখিল করে, নানা দেশের উত্থান-পতনের ও অগ্রগতির ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত ক'রে —আমি প্রমাণ করবো…

—থাক্! বিজ্ঞানীর উৎসাহে বাধা দিয়ে শোভা বলে—শুনেছি, আপনি নাকি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করেন?

—হ্যাঁ, আন্তরিক ভাবেই করি। প্রশ্নটা শুনেই বিজ্ঞানীর উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। গাল-ভরা সিগারেটের ধোঁয়া ফুঁ দিয়ে ঊর্দ্ধে উড়িয়ে বলে—বিশেষ কথা হচ্ছে—আপনার মত বাল-বিধবার পক্ষে অবিবাহিত থাকা, শুধু অসঙ্গত নয়—সমাজের দিক থেকেও অশুভ!

—তাই নাকি? শোভার বিম্বাধরে চাপা হাসি ও চোখে কৌতুকের দৃষ্টি ফুটে ওঠে। অনুসন্ধিৎসু ভাবে জিজ্ঞাসা করে —আপনি কি বিবাহিত?

—আজ্ঞে না। জোড়া-হাত কপালে ঠেকিয়ে স্ত্রীজাতির প্রতি কৃত্রিম শ্রদ্ধা দেখিয়ে বলে—প্রয়োজন বোধ করিনি। সবিনয়ে বহু মাননীয়া কুমারীকে প্রত্যাখ্যান করেছি…

—আপনি তো অতি মহাশয়-লোক। দয়া করে, একটি বাল-বিধবার দুঃখ দূর করুন না?

—কে তিনি? কার কথা বল্‌ছেন আপনি? বিজ্ঞানীর কপাল ঘামে ভিজে যায়। চোখমুখ রাঙা হ'য়ে ওঠে। শোভা কি নিজের কথা বলছে? না, না, তা' হতেই

পারে না। তবে সে মেয়েটি কে? বিজ্ঞানী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। সাগ্রহে জান্‌তে চায়—কে সেই ভাগ্যহীনা?

শোভা দুঃখিতভাবে বলে—সে আমার পরিচিত একটি অন্ধ মেয়ে!

—অন্ধ মেয়ে? বিজ্ঞানী বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকে শোভার মুখের দিকে। হাসতে হাসতে বলে—অন্ধ-মেয়েকে যে বেচারা ঘাড়ের বোঝা করে নিয়েছিল—সে তো মরে বেঁচে গেছে। আমি বেঁচে আছি। আমার মৃত্যু-কামনা করছেন কেন?

শোভা বলে—আপনি ভুল বুঝেছেন। বিয়ের আগে মেয়েটি অন্ধ ছিল না। আপনারই মত একটি সুদর্শন-সুপুরুষকে দেখে সে পাগল হ'য়ে উঠেছিল। বেচারার অবুঝ চোখদুটিকে সেই মহাপুরুষই শাস্তি দিয়ে গেছেন। অতি নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর ছিলেন তিনি···

কপালের ঘাম মুছে বিজ্ঞানী বলে—ছেড়ে দিন সে অন্ধ মেয়ের উপাখ্যান। আমি ভাবছি—আপনার কথা। আপনার মা বল্‌ছেন···

বাধা দিয়ে শোভা বলে—মা কি বলছেন—তা আমি জানি। আমি তো অন্ধ নই? পথের সাথী প্রয়োজন হয় তার, যে দৃষ্টিহীন। আমার জন্যে কোন দুর্ভাবনার প্রয়োজন নেই আপনার···বলেই শোভা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। বিজ্ঞানী অধোবদনে লজ্জিতভাবে গিয়ে দাঁড়ায়, বাইরের একটা খোলা ছাতে। অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থাকে দূর নীলাকাশের দিকে।

দূরে—বহু দূরে— ওই নীল সাগরের পারে কি যেন দেখতে চেষ্টা করে।

শোভার খোঁজে দার্শনিক এসে হাজির হয় সেখানে। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে—কি দেখ্‌ছ বন্ধু! দিনের বেলায় আকাশে তো কোন তারা নেই···

বিজ্ঞানী জিজ্ঞাসা করে—বল্‌তে পার—বন্ধু! ওই মহা-শূন্যের শেষ কোথায়? ওখানে কি আছে?

দার্শনিক বলে—তোমার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তো বস্তুর বাইরে পৌঁছাতে পারবে না? অসহায়ভাবে ফিরে আসবে। অতএব সে ব্যর্থ চেষ্টায় লাভ কি?

—তোমার মুদিত-নয়ন দর্শন কি বলে তাই তো জানতে চাই···

—আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নাই। সে—'আনন্দং রস বৈ সঃ' চোখ দিয়ে দেখা যায় না। মন দিয়ে—অনন্যচিন্তা দিয়ে—তাকে পেতে হয়—অনুভূতির মধ্যে। তাই আমরা মুদিত নয়নেই দেখি···

—আজগুবি! বিদ্রূপের সুরে বিজ্ঞানী বলে—স্বপ্ন-বিলাসী তুমি! চোখবুজে অনেক কিছু খোয়াব দেখো। চোখ চাইলেই তারা যায় পালিয়ে···

—তোমার বেলায়ও তো সে কথা বলা চলে বন্ধু? চোখ মেলে যাদের দেখতে পাও, চোখ বুজলে তারাও কি যায় না পালিয়ে? তখন কে কোথায় থাকে বলো তো?

—সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি—এই চোখ দুটোর উপরেই কি নির্ভর করছে আমাদের অস্তিত্ব ?

—হ্যাঁ, যে ছিল, যে আছে, আর যে থাকবে—সে হচ্ছে সৎ-চিৎ—আনন্দ ! আর কিছুই থাকবে না···

—তুমি একটি বদ্ধ-পাগল ! বিজ্ঞানী হাসে।

দার্শনিক দুঃখিত হয়। অনুযোগের সুরে বলে—শোনো বিজ্ঞানী ! তোমাদের বাহাদুরীকে আমি অস্বীকার করি না। মানুষের ভোগ-লালসা-চরিতার্থের জন্যে বহু পথ আবিষ্কার করেছ তোমরা ! যান্ত্রিক-কৌশলে বন্ধুর জীবন-যাপন পদ্ধতিকে তৈল-মসৃণ ক'রে তুলেছ, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু, ওই মহাশূন্যের দিকে চেয়ে একবার ভাবো—তোমাদের শিশুসুলভ বাহাদুরীগুলির মূল্য কতটুকু ? ওখানে কি আছে জানো ?

—কি ?

—মহাশক্তি ! যে ভূপৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে তোমরা এত বাহাদুরী দেখাচ্ছ, সেই ভূ-মণ্ডলকেই সে পারে ধূলি-মুষ্টির মত ছড়িয়ে দিতে। তাঁকে স্বীকার করো। তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করো···

—তুমি রাঁচি যাচ্ছ কবে ?

—রাঁচি যাবো কেন ?

—বিজ্ঞান-মতে তোমাদের বাসস্থান রাঁচিতেই নির্দ্দিষ্ট হয়েছে···

দার্শনিক অবাক হয়ে চেয়ে থাকে বিজ্ঞানীর মুখের দিকে। রাঁচি-সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই তার।

মুমূর্ষু জীবনকবি। সে নিজেই তার অন্তিম-শয্যা রচনা করেছে কুটির-প্রাঙ্গণে। নরেশের আহ্বানে তার চাষীবন্ধুরা সবাই এসে হাজির হয়েছে সেখানে। এনেছে কত ফুলের মালা ও বরণ-ডালা। শঙ্খধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত হচ্ছে। অনুরাগী ভক্তরা আজ জীবনকবিকে দিচ্ছে বিদায়-অভিনন্দন। কবির মরণ কি একটা মহামহোৎসব ?

একতারাটা নরেশের হাতে তুলে দিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে জীবনকবি গায়—

তোমার আলো মনের গহনে
—জ্বল্‌ছে অনির্ব্বাণ !
হে মহান্! হে মহান্! হে মহান্!
ভয় কি আমার অন্ধকারে—
ওগো জ্যোতির্ম্ময় !
গাইবো তোমার জয়।
গাবো তোমার অভয় ও আশ্রয়।
মিথ্যা জানি, আমার অভিমান।
হে মহান্! হে মহান্! হে মহান্!

দার্শনিকের চোখদুটি সজল হয়ে ওঠে। জীবনকবির বিশীর্ণ চোখে মুখে হাসি ধরে না। একি মৃত্যুর আনন্দ! নরেশ

বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকে কবির মুখের দিকে। জীবন-ধারণের পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে—এমন জীবনান্ত, সে যেন কল্পনা করতেও পারছে না।

—নরেশ! কাছে এসো···কবি ডাকে। দার্শনিকের হাতে নরেশের হাতখানা রেখে জীবনকবি বলে—আমার একতারার উত্তরাধিকারী এই নরেশ! তার অহিংস যাত্রা-পথের নির্দ্দেশ তোমাকেই দিতে হবে। তাকে গড়ে তুল্‌তে হবে—মৃত্যুঞ্জয়-মহামানব! আমার কল্প-পুরুষ, নরশ্রেষ্ঠ-নরেশ! এ ভার তোমার উপরেই রইলো।

ভক্ত-শিষ্যের প্রতি জীবনকবির এ আদেশ—শোভা এসে শোনে। হর্ষে ও বিষাদে চোখের জলে বুক ভাষায়। কবি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—কেঁদনা শোভা! আমার কঙ্কাল আজ পুড়বে। আমার হবে মুক্তি। তাতে দুঃখ কি? আমি তো বেঁচে থাকবো? আমাকে তোমরা পাবে—নরেশের কণ্ঠে, সুরে ও ছন্দে, আর আমার ওই একতারার ঝঙ্কারে···

চোখ মুছে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে শোভা ফিরে আসে। বহুমূল্যবান আস্‌বাবপত্রে সাজানো প্রাসাদ-কক্ষের এককোণে বসে, চেয়ে থাকে বাইরের দিকে। দূরে ওই তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ মধুমতীর খরস্রোত! ওই স্রোতস্বতীর কূলেই কবির কুঠির। কবি আজ চলে যাবে। বোধ হয় মাটির সব রস যাবে শুকিয়ে। গাছে গাছে আর ফুলও ফুটবে না, ফলও ধরবে না।

হঠাৎ শোভা ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে। ওই যে—ওই যে!

চলেছে জীবনকবির শববাহী শোভাযাত্রা! একতারা হাতে নিয়ে গীতকণ্ঠে নরেশ তাদের পুরোভাগে। নরেশ নেচে নেচে গান গায়। সে দৃশ্য দেখে শোভার শোকাশ্রু পায় আনন্দের পুলকস্পর্শ! কানে তার মধুবর্ষণ করে নরেশের সেই গান—

একতারার এই একটি সুরে
প্রাণের সাড়া জগৎ জুড়ে—
বাজ্‌বেরে ভাই! বাজ্‌বে।
বাদলধারা কবির প্রেমে
আকাশ-পথে আস্‌বে নেমে,
ধরার বুকে ফুল ফোটাতে
—আনন্দে প্রাণ নাচ্‌বে।

হঠাৎ পিছন থেকে বসুন্ধরা ডাকেন—শোভা!

ঘাড় ফিরিয়ে শোভা দেখে—বসুন্ধরার সঙ্গে বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীকে দেখলেই আজকাল শোভার চোখ দুটো জ্বালা করে। বিজ্ঞানবুদ্ধিকে যাচাই করবার কৌতুহল এখন আর তার মধ্যে একটুও নেই। বিজ্ঞানীর ক্ষুধিত দৃষ্টি শোভা আর সহ্য করতে পারছে না।

কক্ষে প্রবেশ করেই বসুন্ধরা বলেন—শোনো শোভা! তোমাকে আমি বিয়ে দিতে চাই এই বিজ্ঞানীর সঙ্গে। জান্‌তে এসেছি—সে বিষয়ে তোমার মত কি?

শ্বেতাঙ্গিনী শোভার চোখমুখ রাঙা হয়ে ওঠে। তার সর্ব্বাঙ্গ

থর্ থর্ করে কাঁপ্তে থাকে বাতাহত বেতসীর মত। উত্তেজিত ভাবে শোভা বলে—আচ্ছা মা! আমাকে তুমি কি ভেবেছ বলো তো?

—কি আবার ভাববো? তুমি আমার ভাগ্যহীনা বিধবা মেয়ে! এই কথাই তো ভাব্ছি…

—না, না, আমি ভাগ্যবতী! শোনো একটা স্পষ্টকথা তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। আমি বিধবা নই। আমাকে আর বিরক্ত করো না…

—বিধবা নও? সে কথার মানে? অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বসুন্ধরা চেয়ে থাকেন শোভার আগুনভরা চোখ তুটির দিকে।

—হ্যাঁ, বিধবা নই। শোভা যেন কুপিত ফণা তুলে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। মুক্তার মত দাঁতগুলি দিয়ে রক্ত-রাঙা কম্পিত অধর দংশন করে বলে—কবির কাছে শুনেছি—পুত্রবতীর বৈধব্য মিথ্যা, অনাচার! নরেশের চোখমুখ দেখেও কি সে কথাটা বুঝতে পার না?

—কোন্ কথা? কি বলছিস্ তুই?

—সেই চোখ, সেই নাক, সেই মুখ, সেই কাঁচা-সোনার রং! আর সেই বুকভরা ভালবাসা নিয়েই তো তিনি ফিরে এসেছেন—আমার ছেলে সেজে! আমার কাছে আজ তার একমাত্র দাবী অতি পবিত্র মাতৃস্নেহ! আমার মধ্যে যে মাতৃত্বের উদ্বোধন তিনি করেছেন—আমি কি পারি তা হারাতে? তাঁকে অসম্মান করতে?

বিজ্ঞানী ও বসুন্ধরার বিস্ময়ের সীমা নেই। সৃষ্টিতত্ত্বের এ কোন্ অভিনব আবিস্কার? মাতৃগর্ভে পিতা এসেছেন পুত্র সেজে? নরেশের মুখের দিকে চাইলে, শোভার মৃতস্বামীর মুখখানি মনে পড়ে—একথা বসুন্ধরাও অস্বীকার করতে পারেন না। নরেশ যেন তার পিতার ছাঁচে-ঢালা ভাস্কর্য্য!

কিন্তু, তাতে কি হয়েছে? পুত্রবতীর বৈধব্য মিথ্যা, অনাচার! কবির এই উক্তির তাৎপর্য্য কি? বিজ্ঞানী বা বসুন্ধরা বুঝতে পারেন না। পাগলের প্রলাপ বলেই মনে করেন। বিজ্ঞানী তো হেসেই অস্থির! একটা ফুঁ দিয়ে কথাটাকেও সে সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে দেয় উড়িয়ে।

উত্তেজিতভাবে শোভার কাছে এগিয়ে গিয়ে বসুন্ধরা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—না, না, তা হতে পারে না শোভা! বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। আর কখনো তুমি কবির কুটিরে যেতে পারবে না।

—বলো কি? আমার নরেশ আছে সেখানে। তার মুখখানা না দেখে আমি কি বাঁচতে পারি?

—সে কুটির আমি পুড়িয়ে দেবো...

—নরেশকে বুকে জড়িয়ে ধরে—আমিও পুড়ে মরবো সেই কুটিরের মধ্যে...

—হুঁ! এত দূর? আচ্ছা...দাঁতে দাঁত চেপে সঙ্কল্পের দার্ঢ্য জানিয়ে বসুন্ধরা ঘুরে দাঁড়ান বিজ্ঞানীর দিকে। খুব শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করেন—সব ব্যবস্থা ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ আছে···সবিনয়ে বিজ্ঞানী বলে।

মুখের ভার পরিবর্ত্তন করে আবার বসুন্ধরা ঘুরে দাঁড়ান শোভার দিকে। গম্ভীরভাবে বলেন—আজ থেকে তুমি আমার বন্দিনী। এই কক্ষের বাইরে কোথায়ও যেতে পারবে না। বিজ্ঞানী এসে নিয়মিতভাবেই দেখা-সাক্ষাৎ. করবে। আলাপ আলোচনা চালাবে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে মতিস্থির করো···বলেই তিনি বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

শোভা হাসে। বন্দিনীর সে হাসির অর্থ বিজ্ঞানী বুঝতে পারে না। অপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করে—আপনি হাস্‌ছেন কেন ?

—আপনার অবস্থা দেখে···

—কি অবস্থা দেখছেন আমার ?

—আপনি কি মনে করেন এই দেহটাই আমি ?

—না।

—তবে ?

—আপনার মনও আমি চাই···

—চান্ ? তাই নাকি ? কি ক'রে পাবেন ?

—দেহটাকে পেলেই তো মনকে পাওয়া যায়। মন তো দেহের বাইরে থাকে না ? সে দেহাতীত নয়।

—আপনার বিজ্ঞান তাই বলে বুঝি ?

—ইতিহাসও তাই বলে। ব্যক্তি বা জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসে শুধু দৈহিক সামর্থের জয়-ঘোষণা ছাড়া আর

কি আছে ? কত বিদ্রোহী মন শক্তিমানের কাছে নতি স্বীকার করেছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল পায়ে পরেছে···

—সে বর্ব্বর-যুগের পুণরাবৃত্তি আর হবে না। পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতা প্রাচ্যের মনোবল নষ্ট করে আধিপত্য-বিস্তারে অসমর্থ হবেই। এখনো আপনাকে সাবধান হতে বলি। মা-বসুন্ধরার রাঙা চোখ আর আপনার কোমরের ওই পিস্তল, আমাকে বশীভূত করতে পারবে না। এ কথা নিশ্চয় জানবেন···

—সত্যিই কি তুমি আমার হবে না শোভা ? আমি যে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। আমাকে দয়া করো···কাতরভাবে নতজানু হয়ে বিজ্ঞানী প্রার্থনা জানায়।

একটু হেসে শোভা বলে—আমি যদি এক টুক্‌রো মাংস হতাম, তাহলে তোমার মত হ্যাংলাকে তা অনায়াসেই বিলিয়ে দিতে পারতাম। আমি যে মনের মালিক, তার মৃত্যুভয় নেই। সুখ-দুঃখের আলোড়নও তাকে অভিভূত করে না। সেই কারণেই তোমাকে সাবধান হতে বলছি···

বিজ্ঞানী ছুটে যায় দার্শনিকের কাছে। শোভার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্জ্জ্ঞেয় বা দুর্বোধ্য মনে হয়। পুত্রবতীর বৈধব্য মিথ্যা। পিতা বেঁচে থাকে পুত্ররূপে। স্ত্রীকে স্বামী করে মাতৃসম্বোধন—সৃষ্টির এ রহস্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তর্কের বাইরে। বিজ্ঞানীর মতে—দেহীর জন্ম যেমন একটা জৈব-গঠন বা প্রাকৃতিক ঘটনা-সমাবেশের অবশ্যম্ভাবী ফল, মৃত্যুও তেমনি সেই ঘটনার অনিশ্চিত বিপর্য্যয়। এই টুকু ছাড়া বিজ্ঞানী

আর কিছু জানে না বা জানতেও চায় না। আত্মার পুণরাবর্ত্তন সম্বন্ধে সে সন্দিহান। দার্শনিকের সঙ্গে বহু বিতর্কের পরেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে পারে না সে।

পরের দিন দার্শনিককে সঙ্গে নিয়েই বিজ্ঞানী এসে হাজির হয় শোভার দরবারে। দার্শনিককে দেখে, শোভা খুব শান্ত ও সংযতভাবে এগিয়ে আসে আলোচনা করতে।

—বলতে পারেন—পুত্রের সঙ্গে পিতার সম্বন্ধ কি? দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করে শোভা।

দার্শনিক বলে—একোঽহং বহুস্যাম—পিতার এই ভগবদিচ্ছার বিকাশ ছাড়া পুত্র তো আর কিছুই নয়? যে পিতা, সেই পুত্র। 'দেহিনোস্মিন্ যথা দেহে, কৌমারং যৌবনং জ্বরা, তথা—দেহান্তর প্রাপ্তি!' দেহান্তরিত আত্মা অজর ও অমর। মৃত্যু আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির বিভীষিকাময় ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিজ্ঞানী চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করে—পুত্রবতী শোভাদেবীর বৈধব্য মিথ্যা, অনাচার—জীবনকবির এ উক্তি কি সত্যি মনে করো?

—মিথ্যা মনে করবার কোন কারণ তো নেই, বন্ধু! বিশেষ কথা হচ্ছে—যার মন বিধবা হয়নি তাকে বিধবা মনে করা মূর্খতা। প্রেমাস্পদের পুণ্য-স্মৃতি যার মনে জাগ্রত থাকে, সে মেয়ে কি পারে অন্য পুরুষকে আত্ম-নিবেদন করতে? একতারার একটি তারই তো শোভার প্রাণে সুর বাজায়···

জীবনকবি যে দার্শনিকের গুরু—এ কথা বসুন্ধরা জানেন।

সেই কারণেই তার ইচ্ছা নয়—দার্শনিক আর কখনো দেখা-সাক্ষাৎ করে শোভার সঙ্গে। জীবনকবির মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তার একতারাটি রয়ে গেছে নরেশের হাতে। আর, তার বিষাক্ত জিহ্বাটির মালিক হয়েছে ওই দার্শনিক! নরেশ আর দার্শনিক নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বসুন্ধরার মনে তো শান্তি নেই?

আঁড়ালে দাঁড়িয়ে শোভা-সম্বন্ধে দার্শনিকের অনভিপ্রেত মন্তব্য শুনে বসুন্ধরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। উত্তেজিতভাবে এসে চিৎকার করে বলেন—কে ডেকেছে তোমাকে? কেন তুমি এসেছ এখানে?

দার্শনিক একটু হেসে বলে—আমার মনে কোন বিদ্বেষ-বুদ্ধি নাই। এই রাজপরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী আমি। অনাহুত ভাবে এলেও আমার কোন অপরাধ হয় না…

—শুভাকাঙ্ক্ষী তুমি? বসুন্ধরা গর্জ্জে ওঠেন।

—হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই কারণেই এসেছি—আপনার বিধবা-কন্যার অন্যায় ও অসঙ্গত বিবাহ-প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে। বিজ্ঞানী মূর্খ বলেই রাজ-কন্যা শোভাকে চিনতে পারে নি। আপনিও কি তাকে চেনেন না? আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন?

—কি?

—কেন আপনি বিধবা-মেয়েকে বিয়ে দিতে চান? বলুন তো—আপনার উদ্দেশ্য কি?

—আমার এ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করবে কে? নরেশ

জাহান্নমে গেছে। আমি চাই—শোভা আবার সন্তানের মা হোক···

দার্শনিক উচ্চ রোলে হেসে ওঠে। হাস্‌তে হাসতে বলে—নরেশ-জননী শোভা খুব শীগগীরই বহুসন্তানের মা হবেন। আপনার এই অতুল ঐশ্বর্য্য যারা ভোগদখল করবে—তারা দল বেঁধেই আস্‌ছে···

বসুন্ধরা বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করেন—কারা আসছে?

—ঐশ্বর্য্যের অভিমানে যাদের আপনি চিরদিনই অশ্রদ্ধা করেন—অগ্রাহ্য করেন। নরেশের একতারার সুরে সুর মিলিয়ে তারাও আজ নরেশের মাকে মা বলে ডাকবে। তারা একজন নয়, দু'জন নয়। হাজার-হাজার ক্ষুধিত মাতৃহারা! অন্নহীন ও বস্ত্রহীন বুভুক্ষুর দল!

দার্শনিকের কথা শুনে শোভার সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ জাগে। স্নেহরসে বক্ষবস্ত্র সিক্ত হয়ে ওঠে। বুকে জাগে পুলক-স্পন্দন। কম্পিত কণ্ঠে ও অস্ফুটস্বরে সে জিজ্ঞাসা করে—কোথায় তারা? কোথায় তারা?

ব্যথিতভাবে দার্শনিক বলে—দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাভাস কি দেখতে পাচ্ছ না মা? কবির তিরোভাবের পর এ দেশে অনাবৃষ্টি ও অজন্মা আরম্ভ হয়েছে। শীগগীরই অন্নহীন প্রজাসাধারণের ক্ষুধিত আর্ত্তনাদ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলবে···

—তা'তে শোভার কি ক্ষতিটা হবে শুনি? অতি বিরক্ত-ভাবে জিজ্ঞাসা করেন বসুন্ধরা।

—তখন মা-শোভা কি ভাণ্ডার-দ্বার না খুলে পারবেন? দার্শনিক হাসে।

—শোভা কে? ভাণ্ডার কার? এখনো বেঁচে আছি আমি। সে চাবিকাটি আমার হাতে···

—ফ্যান্ দাও মা—ফ্যান্ দাও মা—এ করুণ ক্রন্দন কি আপনাকেও বিচলিত করবে না? আপনারও কি মনে পড়বে না—নির্ম্মম বাল্যস্মৃতি! জীবনকবি আপনাকে কি ভাবে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন—সে খবর আমি রাখি। অতীত দুর্গতির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া আপনার পক্ষেও সম্ভব হবে না···

বসুন্ধরার চোখমুখ রাঙা হ'য়ে ওঠে। সযত্নে ভুলে-থাকা শৈশবের নিদারুণ মর্ম্মপীড়া মনে পড়ে যায়। ফ্যান্ দাও মা! এ আর্ত্তস্বর একদিন তার কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছিল। সে বিস্মৃত দিনগুলি মনের কোণে উঁকি দিলে, বসুন্ধরা যেন ভয়ে শিউরে ওঠেন। পিছনের ক্ষতস্থানগুলিকে সযত্নে ঢেকে রেখেই সামনে এগিয়ে যেতে চান তিনি। সেগুলিকে নিজেও দেখতে চান না, বা অপরকেও দেখাতে চান না।

আজ তিনি রাণী-বসুন্ধরা! ফ্যানের কাঙাল ভিখারিণী বসুন্ধরাকে যে চেনে, তাকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। সেই কারণেই জীবনদাতা জীবনকবি ছিল তার চক্ষুশূল! কবি চলে গেছে। যাবার আগে, দার্শনিক আর নরেশকে চিনিয়ে দিয়ে গেছে—এই ছিন্নমূল রাণী বসুন্ধরা কে?

কী লজ্জা! কী অপমান! জীবনকবির মত, দার্শনিক আর

নরেশও কেন যায় না নির্ম্মূল হ'য়ে? ক্রোধে বসুন্ধরা হয়ে ওঠেন অগ্নি-মূর্ত্তি! দার্শনিকের দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করে, উত্তেজিত ভাবে বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করেন—ওই বিষাক্ত সাপটাকে কেন নিয়ে এসেছ এখানে?

বিভ্রান্তভাবে বিজ্ঞানী বলে—ভুল করেছি···

হাসতে হাসতে বসুন্ধরার দিকে চেয়ে দার্শনিক বলে—আপনিও ভুল করছেন। আমি সম্পূর্ণ নির্ব্বিষ! বিজ্ঞানীর দিকে চেয়ে বলে—শোনো বন্ধু! তোমার ভুল—শোভাদেবীকে চিনতে না পারা। ভুলের উপর ভুল সাজিয়ে আর ভুলের স্তম্ভ তৈরি করো না। আমার দৃষ্টি নিয়ে ওকে বুঝতে ও চিনতে চেষ্টা করো। স্বার্থচিন্তা মানুষকে অবুঝ ও অসঙ্গত করে। শোভাদেবী আজ মূর্ত্তিমতী মাতৃত্ব! তাকে অসম্মান করো না···

বসুন্ধরা জানেন—এই দার্শনিক একটা বিশিষ্ট মতবাদের সমর্থক। যাদের অভিমত—ধনীর সম্পদে নির্ধনের দাবী আছে। কবিও বল্‌তো, দার্শনিকও বল্‌ছে—ধনীরা পরস্বাপহারী দস্যু। দেশে দুর্ভিক্ষ বা অন্নাভাব ঘট্‌লে ধনীর ভাণ্ডার-দ্বার খুলতে হবে।

কিন্তু কেন? ফ্যান্ দাও মা, এ করুণ ক্রন্দনের মধ্যে যে কাতরতা আছে—তার সঙ্গে আছে বসুন্ধরার পরিচয়। ক্রন্দনের করুণ সুর যে কি ভাবে আজ দাবীর বজ্র-নির্ঘোষে পরিণত হতে পারে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। একটু ফ্যানের জন্যে কেঁদে কেঁদে সে দিন বসুন্ধরা পেরেছিলেন জীবনকবির

মন গলাতে। তাই তো পেয়েছিলেন এক মুঠো অন্নের সন্ধান? তিনি নিয়েছিলেন—একজন সহৃদয় ব্যক্তির মানসিক দুর্ব্বলতার সুযোগ। সেখানে কোন দাবীর প্রশ্ন ছিল কি?

ছায়াছবির মত বসুন্ধরার চিত্তপটে ভেসে ওঠে ভুলতে চেষ্টা করা গ্লানিকর বাল্যস্মৃতিগুলি। সে তো ছিল নিতান্তই আস্তাকুঁড়ে-পাতচাটা সারমেয়-বৃত্তি! ভিক্ষার অন্নে ভিক্ষুকের কোন দাবী ছিল না—একথা নিশ্চয়।

কত আদর ও যত্নে জীবনকবি লালন-পালন করেছিলেন—একটি অজ্ঞাত-পরিচয় দুঃখিনী ভিখারিণীকে। ধীরে ধীরে যৌবনশ্রী জেগে উঠলো তার অঙ্গে। জীবনকবি সাজালেন তাকে পুষ্পরাণী। পবিত্রতাময়ী বিশ্বপ্রকৃতির পূজারিণী। কিন্তু তার অন্তর থেকে কাঙালিনীর দৈন্য দূর হলো না। ফ্যান্ দাও মা—এ আর্ত্তনাদ সে ভুলতে পারলো না। অন্তরের ক্ষুধাও হলো না নিবৃত্ত।

হঠাৎ একদিন বিলাসিতায় বিতৃষ্ণ সূর্য্যবংশীয় এক রাজা যাচ্ছিলেন সেই পথে। ভিখারিণী করলো তার দৃষ্টি আকর্ষণ—আশ্রমবাসিনী পুষ্পরাণীর বাহ্য সৌন্দর্য্য দিয়ে। কাঙালিনীর অন্তরের ক্ষুধা হঠাৎ তৃপ্ত হলো, রাণী সেজে। কিন্তু সে পরিতৃপ্তি নিতান্তই সাময়িক। ঘী ঢেলে আগুন নেবানো যায় না। সে আরো ঘী চায় লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে। বীতশ্রদ্ধ রাজা বৈরাগ্যে মুহ্যমান ছিলেন। কিন্তু রাণীর ভোগাসক্তি দশ হাতে আত্ম-তৃপ্তির চেষ্টায় অনলস হ'য়ে উঠ্লো।

একমাত্র বিধবা-কন্যা শোভাকে আর একটা বিবাহ দিয়ে সুখী করার চেষ্টা—বসুন্ধরার পক্ষে যেমন আন্তরিক, তেমনি অকৃত্রিম। সত্যিই তিনি চান—পুত্রবতী শোভা তার মতই সুখৈশ্বর্য্যের মাদকতায় মেতে উঠুক। শোভার পুত্রকন্যায় ভরে উঠুক রাজপ্রাসাদ। কেন জীবনকবি নরেশকে কেড়ে নিয়েছে? রাজপুরীর ভবিষ্যৎ কি অন্ধকার নয়? জীবনদাতা পিতা হলেও —জীবনকবি যে ছিল তার পরম শত্রু, সে বিষয়ে আজ আর বসুন্ধরার মনে কোন সন্দেহ নেই।

উত্তরাধিকার-সূত্রে দার্শনিক এসেছে সেই পরম শত্রুতার চরম পরিণতি ঘটাতে। শোভার মস্তকটি চর্ব্বণ করতে। মুর্খ শোভা! তাকে দার্শনিকের হাত থেকে উদ্ধার করবার উপায় কি? উত্তেজিতভাবে বসুন্ধরা দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করেন—কি চাও তুমি? তোমার উদ্দেশ্য কি?

—কোন উদ্দেশ্য নিয়েও আসিনি এখানে, বা কোন চাহিদাও নেই আমার…

—শোভার মুখের দিকে ও ভাবে তাকিয়ে আছ কেন?

—দেখ্‌ছি……

—কি দেখছো?

—অপূর্ব্ব মাতৃ-মুর্ত্তি! অন্নহীন ক্ষুধিতের দল যে দিন আপনার দ্বারে এসে মা, মা, বলে কাঁদবে—সেদিন ওর মাতৃ-হৃদয় নিশ্চয়ই কেঁদে উঠবে। আপনি বাধ্য হবেন ভাণ্ডার-দ্বার খুলে দিতে…

—বাধ্য হবো ?

—নিশ্চয়ই ! ছেলেমেয়েরা অনাহারে শুকিয়ে মরলে, মা কি বাঁচতে পারে ? শোভার মৃত্যু আপনি সহ্য করবেন কি করে ?

—শোভা মরবে ?

—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আপনি যেদিন এক ফোঁটা ফ্যানের জন্যে কেঁদেছিলেন, সে দিন হয়তো শোভার মত মা এ দেশে একটিও ছিল না। আজ ওই মাতৃমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও উদ্বোধন কে করেছে—জানেন ?

—কে ?

—আপনার পালক-পিতা জীবনকবি। আমার গুরুদেব ! যুক্ত-কর কপালে ঠেকিয়ে পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে দার্শনিক। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখমুখ যেন কি এক দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সদম্ভে সে বলে—ওই জাগ্রত মাতৃমূর্ত্তির হৃদ-স্পন্দন বন্দ না হলে, আজ আর কেউ ফ্যান্ দাও বলে কাঁদবে না। তার আগেই অন্ন পাবে। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার-দ্বার খুলে যাবে। এ কথা আমি নিশ্চয় জানি······

—না, না, সে দ্বার খুলতে দেব না আমি······বসুন্ধরা গর্জ্জে ওঠেন।

দার্শনিক হেসে বলে—কে আপনি ? কতটুকু আপনার শক্তি ? হাজার কণ্ঠে মা, মা, বলে ডেকে, শোভার মা বসুন্ধরাকেও যদি তারা জাগাতে না পারে—তা'হলে শুধু

শোভা মরবে না। শোভার ডাইনী-মাকেও এবার মরতে হবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই···

ক্রোধে বসুন্ধরা জ্ঞানহারা হয়ে যান। চিৎকার করে বলেন—বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে···

—যে আজ্ঞে, যাচ্ছি। বিজ্ঞানীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সবিনয়ে দার্শনিক জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি করবে বন্ধু ?

—তুমি কি করতে বলো ?

—টক্ আঙুরে লোভী না-হওয়াই ভাল···

—আমি তো শৃগাল নই ?

—নখদংষ্ট্রায়ুধ শার্দ্দুল—তা' জানি। কিন্তু বন্ধু! শুধু পশু-বলের সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার হয় না। সুস্থ মানুষের চিন্তাশীলতা একেবারেই হারিও না···

বিজ্ঞানী একটু হেসে বলে—তোমার চিন্তা আর আমার চিন্তা তো এক নয় বন্ধু! তুমি ত্যাগী, আমি ভোগী। সুন্দরী শোভার পাণিপ্রার্থী আমি। রাণী-বসুন্ধরা যদি শ্রীমতীকে আমার হাতেই সম্প্রদান করেন, তা'হলে এ রাজৈশ্বর্য্য রক্ষার দায়িত্ব আমাকেই গ্রহণ করতে হবে।

—পারবে ?

—কেন পারবো না? আত্মরক্ষা আর আত্ম-প্রতিষ্ঠাই জগতের নীতি। কতকগুলো উচ্ছৃঙ্খল বুভুক্ষুকে ক্ষেপিয়ে তুমি এই রাজ্যটাকে ধ্বংস করবে, আর আমি বুঝি দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো—ভাব্‌ছো ?

—কি করবে ?

—বিজ্ঞানের দৌলতে এই যন্ত্রযুগে তো মারণাস্ত্রের কোন অভাব নাই বন্ধু ! হাজার-হাজার নিরস্ত্র মুর্খদের গতিরোধ করতে একটি মাত্র আগ্নেয়-অস্ত্রই যথেষ্ট। রাজপথে মৃতদেহ স্তুপীকৃত হবে, তবু এই রাজপ্রাসাদের কোন অনিষ্ট হবে না।

—সে ধ্বংস-যজ্ঞের পরিণাম চিন্তা করেছ ?

— সৃষ্টির কৌশল যে জানে, ধ্বংসের ভয়ে একটুও ভীত হয় না সে। ধ্বংসের মধ্যেই সে পায় সৃষ্টির আনন্দ ! পুরাতনের ধ্বংস ছাড়া কেন হবে—নবীনের উদ্বোধন ?

দার্শনিক বিচলিত হয়ে ওঠে। উচ্ছ্বসিতভাবে হাত-পা ছুড়ে বলতে থাকে—হাজার-হাজার শিল্পীর কায়িক শ্রমে এই রাজ-প্রাসাদ গড়ে উঠেছে ! হাজার-হাজার কৃষিজীবীর বুকের রক্ত-জলকরা আনুগত্যে ভরে উঠেছে এই রাজ-ভাণ্ডার ! তাদের অভাবে কি প্রাসাদ-চূড়া ভেঙে পড়বে না ? রাজভাণ্ডার শূন্য হবে না ? রাণী-বসুন্ধরা কি রাজত্ব করবেন শ্মশানে ব'সে ?

বসুন্ধরা আর সহ্য করতে পারেন না। বিজ্ঞানীকে আদেশ করেন—দার্শনিককে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে তাড়িয়ে দাও······

—তাই নাকি ? আচ্ছা, তাহলে আজ আসি। পূর্ণ-চন্দ্র নরেশকে সঙ্গে নিয়ে যে দিন এই রাজপুরীতে এসে উদয় হবো, সেই দিন দেবো আপনার অর্দ্ধচন্দ্রের জবাব······বলেই দার্শনিক দরজা পর্য্যন্ত ছুটে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। বসুন্ধরাকে জানায় একটা শুষ্ক নমস্কার। তারপর বিজ্ঞানীকে সম্বোধন

ক'রে বলে—শোনো বন্ধু ! শোভাদেবীর রূপ-লাবণ্যের মোহে আর রাজ্যৈশ্বর্য্যের লোভে তুমি যে উন্মাদ হ'য়ে উঠেছ—তা' বুঝ্‌তে পারছি। উন্মত্ত মদগর্ব্বীর পক্ষে যে—অকরণীয় কিছুই থাকতে পারে না—তাও জানি। তবু তোমাকে বলে যাচ্ছি—তোমার প্রথম দুরাশার আগুনে পুড়ে, দ্বিতীয় দুর্লোভও ছাই হ'য়ে যাবে। রাণী-বসুন্ধরার সাহায্যে, বন্দুক দিয়ে ঘিরে, শোভাদেবীকে হয়তো বিয়ে করতে পারবে তুমি। কিন্তু তার মনকে যে জয় করতে পারবে না, একথা আমি নিশ্চয় জানি। জীবনকবির মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্রে দীক্ষিত সে মন, তারই একতারার একটি তারে বাঁধা। সেই একতারা আজও ঝঙ্‌কার তুল্‌ছে শ্রীমান নরেশের হাতে। খুব সাবধান·····

দার্শনিক চলে যায়। কক্ষমধ্যে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। রুদ্ধশ্বাস প্রস্তরমূর্ত্তির মতই দাঁড়িয়ে থাকেন বসুন্ধরা ও বিজ্ঞানী।

ধীরে ধীরে শোভার কাছে এগিয়ে গিয়ে বসুন্ধরা দেখতে পান—শোভা মূর্চ্ছিতা।

বন্দিনী শোভার বিয়ের বাজনা বেজে ওঠে। নিরানন্দ কবির কুটিরে বসে নরেশ শোনে সেই সুমধুর সানাইয়ের সুর। সুরের মাধুর্য্য তার বুকে বেঁধে শাণিত ছুরির মত। গাল বেয়ে দু'চোখের জল গড়ায়।

অদূরে চাষীপল্লী। সেখানেও আনন্দ নেই। অনাবৃষ্টির ফলে মাঠের মাটি শুকিয়ে পাথরের মত শক্ত হ'য়ে গেছে। চাষীরা লাঙল চালাবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে। কঙ্কালসার গরুগুলি কাঁধের লাঙল কাঁধে নিয়েই শুক্‌নো জমিতে শুয়ে পড়ে। টান্‌তে পারে না। টান্‌বার শক্তি তো তাদের নেই? মাটি শুঁকে শুঁকে ঘুরে বেড়ায় তারা। কোথায়ও এক গাছি সবুজ তৃণের সন্ধান পায় না। পুকুর-ডোবার জলও শুকিয়ে আস্‌ছে। পল্লীবধূরা উলু দিয়ে আর শাঁখ বাজিয়ে পর্জ্জন্য-দেবের পূজা করছে। হে ঠাকুর! জল দাও, জল দাও···

কবির তিরোভাবের পর ছ'মাস গত হয়ে গেছে। শোভা আর একটিবারও আসেনি কবির কুটিরে। মা তার সন্তানকে ভুলে গেছে। বিয়ের আনন্দে মেতে উঠেছে। নরেশ ভেঙে পড়েছে এই দুরন্ত অভিমানের ভারে। লজ্জায় ও ঘৃণায় মিশে গেছে মাটির সঙ্গে। আজকাল সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। একতারাটা পড়ে থাকে একধারে। মনের ভুলেও কখনো

তাতে ঝঙ্কার তোলে না। নরেশ তো জানে না শোভা বন্দিনী! সানাইয়ের মধুর রাগিণীর ভিতর দিয়ে বন্দিনীর করুণ ক্রন্দন তো এসে পৌঁছাচ্ছে না—নরেশের কানে? শোভার অবস্থা সে কি করে জান্‌বে ?

শোভা নরেশকে একেবারেই ভুলে গেছে। এ ধারণা নরেশের মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে। কেন সে একটিবারও আসে না নরেশকে দেখ্‌তে? স্নেহময়ী জননীর এ ঘৃণ্য আচরণ নরেশকে বিস্মিত করেছে। ব্যথিত ও মর্ম্মাহত করেছে। চোখভরা জল নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে নরেশ বলে—না, না, পর্জ্জন্যদেব! এক ফোঁটা জলও দিও না তুমি। এ দেশ জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাক্! তোমার তো বজ্র আছে? তার একটা ফেলে দাও ওই রাজপ্রাসাদের চূড়ায়।

নরেশ নির্জ্জনে বসে কাঁদে। দার্শনিক এসে জিজ্ঞাসা করে—কাঁদ্‌ছো কেন নরেশ ?

নরেশ কোন কথা বলে না। শুধুই কাঁদে। দার্শনিকের ধারণা ছিল—শোভার বিয়ে অসম্ভব। এত দিন সেই কথাই দার্শনিক বলেছে নরেশকে। আজ তো আর সে সান্ত্বনা নরেশ মান্‌বে না। শুভ-দিনে নহবতের ওই মধুর রাগিণী কি মিথ্যে হতে পারে ?

রাজপুরীতে দার্শনিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবুও সে একবার জান্‌তে চেষ্টা করে—ব্যাপার কি? সত্যিই কি শোভা সম্মতি দান করেছে? নতুবা এ আয়োজন কিসের? রাজপ্রাসাদের

তোরণদ্বারে মঙ্গল-ঘট কেন? কেন এত জন-সমাগম? রাজকর্ম্মচারীদের এই আনন্দোচ্ছ্বাসের হেতু কি? শোভা যে বিজ্ঞানীর পিস্তলের সাম্‌নে নতজানু হবে—এ কথা দার্শনিক ভাব্‌তেই পারে না। তবে? এ বিবাহোৎসবে শোভার অন্তরও কি সাড়া দিচ্ছে? অসম্ভব!

অপরাহ্ণে নরেশ শুন্‌তে পায়—চাষীপল্লীতে এক বিরাট জনসভার সমাবেশ হয়েছে। কিসের সভা? কে আহ্বান করেছে? আলোচ্য বিষয় কি? কিছুই জানেনা নরেশ। তবুও একবার যায় সেখানে, চোরের মত লুকিয়ে। পরিচিত কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ না হয়, সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা নিয়ে। জনতার আঁড়ালে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে, আত্মগোপন করে।

সমবেত চাষীদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে—মুণ্ডিত মস্তক ও কৌপীনধারী দার্শনিক।

সে বল্‌ছে—ওরে অন্নহীন-বস্ত্রহীন মুক ও বধিরের দল! তোরা কি শুন্‌তে পাস্‌ না—রাজপ্রাসাদের নহবতে 'আজ কিসের বাজনা বাজে? বিধবা রাজকন্যার বিবাহোৎসব! ভুরিভোজনের বিরাট ব্যবস্থা! দেশ-দেশান্তরের ধনী-মহাজনরা এসে বিবাহসভার শোভাবর্দ্ধন করবে। তোরা অন্নহীন, কিন্তু তোদের রাজপুরীতে আজ মণ্ডা-মিঠাই গড়াগড়ি যাচ্ছে। এক ফোঁটা তৃষ্ণার জল পাস্‌না তোরা, কিন্তু সেখানে বয়ে যাচ্ছে—অতি উগ্র ও তীব্র পানীয়ের ঢেউ! তোদের শ্রমের মূল্য

দিয়েই ওই রাজপ্রাসাদ গড়ে উঠেছে। তোদের অন্ন কেড়ে নিয়েই তৈরি হচ্ছে—ওদের অন্নের নির্য্যাস!

একজন বৃদ্ধ চাষী কপালে করাঘাত করে বলে—আমাদের অদৃষ্ট!

দার্শনিক বলে—অদৃষ্টকে দেখ্‌তে চেষ্টা করো। বুঝ্‌তে চেষ্টা করো। ওই রাজপ্রাসাদের প্রত্যেকটি ইঁটের সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ প্রভু-ভৃত্যের নয়। দাতা-গ্রহীতার নয়। দূরবর্ত্তী অনাত্মীয়েরও নয়। সে সম্বন্ধ, অতি নিবিড় ও মধুর—মা ও ছেলের। সন্তান কি মার নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে? কেন তোমরা আজ হাজারে-হাজারে গিয়ে হাজির হবে না, রাণী বসুন্ধরার দরবারে? ক্ষুধিত ভিক্ষুকের কাতর প্রার্থনা নিয়ে নয়। সন্তানের বেঁচে-থাকার ন্যায্য দাবী নিয়ে, কেন তোমরা গিয়ে দাঁড়াবে না সেখানে?

আঁড়ালে মুখ লুকিয়ে অজ্ঞাত ও অপরিচিতের মত নরেশ চিৎকার ক'রে বলে—এ হ্যাংলামোর কোন মানে হয় না···

—কেন হবে না? দার্শনিক প্রত্যুত্তরে বলে—অনাবৃষ্টির জন্যে যদি পর্জ্জন্য-দেবের কাছে জল চাইতে পার, তা'হলে রাণীমার কাছে বেঁচে-থাকার দাবী জানাতে পারবে না কেন? কে তাকে করেছে—প্রচুর ধনসম্পদের মালিক? রাজভাণ্ডারে রক্ষিত খাদ্যশস্য কাদের জন্যে? জননীর স্তন্যে সন্তানের দাবী —জন্মগত।

নরেশ আর আত্মগোপন করে থাকতে পারে না। জনতা

ভেদ করে দার্শনিকের কাছে গিয়ে বলে—জননীর স্তন্যে সন্তানের দাবী—জন্মগত—এ কথা আমি স্বীকার করি না…

—কে ? কে ? নরেশ ? কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? আমি তোমাকে বহু খুঁজেছি…বলেই দার্শনিক তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

নরেশ লজ্জিতভাবে বলে—আমি লুকিয়েছিলাম। মানুষকে মুখ দেখাতে ইচ্ছা করছে না আমার। তবুও আমি এসে দাঁড়িয়েছি আপনার সাম্‌নে—আপনার এই অহেতুক উত্তেজনার প্রতিবাদ জানাতে। কোন্ অধিকারে রাজকন্যার বিবাহোৎসব পণ্ড করতে চান আপনি ?

—কি বল্‌ছো তুমি ? এ বিয়ে কি তুমি সমর্থন করো ?

—কেন করবো না ?

—তিনি যে তোমার মা !

—আমার মা যদি সুখী হন্—নিজের চোখের জল মুছেও আমি তার সুখ ও শান্তি কামনা করি…

—তুমি কি জানো না—তোমার মা বন্দিনী ?

—বন্দিনী ! নরেশ চম্‌কে ওঠে।

—হ্যাঁ, অতি অসহায় বন্দিনী। এ বিয়ের মানে হচ্ছে—সেই অসহায় বন্দিনীর প্রতি বলদর্পীর অন্যায় অত্যাচার ! তিলে তিলে তিনি আজ মৃত্যুমুখে…

—এ কথা এত দিন আমাকে বলেন নি কেন ?

—আমিও জান্‌তাম না। আজ তোমাদের রাজপুরীর

এক বিশ্বস্ত পরিচারিকার মুখে শুনেছি—ছ'মাস তিনি একটি নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আবদ্ধ আছেন। বন্দীদশায় চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। এ কথাও শুনেছি যে—শুধু তোমার মুখখানি একবার দেখবার আশায় মরতেও পারছেন না···

—আমার মা বন্দিনী? নরেশ ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে। তার ওষ্ঠাধর কাঁপতে থাকে। নাসারন্ধ্র ঘন ঘন বিস্ফারিত হয়। ক্রুদ্ধ অজগরের মত ফুলে ফুলে সে যেন তার দেহের আয়তনও বাড়িয়ে তোলে। ধীরে ধীরে চোখের জল শুকিয়ে যায় মাথার আগুনে।

জনতাকে সম্বোধন ক'রে নরেশ বলে—বন্ধুগণ! অন্নের কাঙাল সেজে রাজদ্বারে যাবো না আমি। সে আত্মাবমাননার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয় মনে করি। স্বীকার করি—চাষীরাই অন্নের মালিক। বল্‌তে পারো—কেন তোমরা আজ রাণী-বসুন্ধরার অন্নদাস হয়ে পড়েছ? কেন আত্ম-সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছ? এ আত্ম-বিস্মৃতির প্রতীকার এক দিনে হতে পারে না। সকলের আগে—তোমাদের আত্মস্থ হতে হবে···

দার্শনিক বিব্রত হয়ে পড়ে। নরেশের বক্তব্য বুঝতে না পেরে বিচলিতভাবে জিজ্ঞাসা করে—তা'হলে তোমার মত কি? তুমি কি বল্‌তে চাও—সে কথাটা পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে বলো···

নরেশ বলে—আমার বক্তব্য—আমিও আজ একজন চাষী! আমার মা, এই চাষীদেরও মা। সমবেত চেষ্টায় আগে আমরা

মাতৃ-উদ্ধার করবো, সন্তানের দাবী প্রতিষ্ঠা করবো। বন্দিনী বিধবার প্রতি এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতীকার করবো। চলো—কে যাবে আমার সঙ্গে? মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়েই চলো। সাহসীর মৃত্যু হয় মাত্র একবার। ভীরু কাপুরুষরা বহু বার মরে। তাদের উদরান্নের দাবীও মিথ্যে।

জনসমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কোলাহলোত্তীর্ণ বহুকণ্ঠের সমর্থনে নরেশের মাতৃ-উদ্ধারের প্রস্তাবটি গ্রহীত হয়। প্রায় সকলেই সমস্বরে স্বীকার করে—রাজকুমার নরেশের মা আজ আমাদেরও মা। মাতৃ-উদ্ধার মন্ত্রে দীক্ষিত সন্তানদের মধ্যে —সাজো সাজো রব পড়ে যায়।

কেউ কেউ সন্দিগ্ধভাবে প্রতিবাদ জানায়—আমরা নিরস্ত্র। সঙ্গীনধারী সৈনিকরা যদি আক্রমণ করে, তা'হলে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে? চিন্তার বিষয়। সবল ও দুর্ব্বলের অসম-দ্বন্দে দুর্ব্বলের পরাজয় সুনিশ্চিত!

অত্যুৎসাহীরা প্রতিবাদেরও প্রতিবাদ জানিয়ে বলে—তা'বলে কি আমরা মার অপমান সহ্য করবো? দা-কুড়ুল, খোন্তা-কোদাল, লাঠিশড়কী, যার যা আছে, তাই নিয়ে ছুটে এসো। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পাতন!

সেই উত্তেজিত জনস্রোতের সাম্‌নে এসে করজোড়ে দাঁড়িয়ে দার্শনিক বলে—একটু দাঁড়াও। আমার কয়েকটি কথা শোনো। সবল ও দুর্ব্বলের অসম-দ্বন্দ্বে, দুর্ব্বলের পরাজয় সুনিশ্চিত—এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু কিসে তোমরা

দুর্ব্বল ? অস্ত্রশস্ত্রই কি বলবীর্য্য-প্রকাশের একমাত্র সহায়ক ? মৃত্যুঞ্জয় আত্মিক-শক্তির উদ্বোধন করতে যদি না পারো, পশু-বল সংগ্রহই যদি তোমাদের একমাত্র কাম্য হয়—তা'হলে যেওনা সেখানে। তোমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত···

নরেশ জিজ্ঞাসা করে—আপনি কি বলতে চান ? আপনার পরামর্শ কি ?

—আমিও বল্‌ছি—আত্মস্থ হও! সম্পূর্ণ অহিংস ও অবিচলিতভাবে গিয়ে দাঁড়াও সেই পিস্তলধারী বলদর্পীর সাম্‌নে। উদ্‌বুদ্ধ আত্মিক-শক্তির পূর্ণ-বিকাশ দেখলে নিশ্চয়ই তার বুকের ভিতর কেঁপে উঠবে। হাতের পিস্তল খসে পড়ে যাবে। মানুষের অস্ত্র-সজ্জার মূলে আছে শুধু ভয় ও ভীরুতা। কিসের ভয় তোমাদের? তোমরা হও অভী! অভীরা কেন ভীরুতার প্রশ্রয় দেবে? মৃত্যুঞ্জয় অমৃতের সন্তান তোমরা। আগে মৃত্যুভয়কে জয় করো—তাহলেই যুদ্ধজয় সুনিশ্চিত··

নরেশ বলে—বেশ, তবে তাই হোক! অস্ত্র-সজ্জার কোন প্রয়োজন নাই। একতারা বাজিয়ে আমিই যাবো, তোমাদের সকলের আগে। মার মুখখানি চোখের সাম্‌নে রেখে, এই বুক দিয়েই সঙ্গীন ঠেলে এগিয়ে যাবো। নিজের বুকটাকে নিজেই ক্ষত-বিক্ষত করবো, তবু একটি পাও পিছু হটবো না। কিন্তু বন্ধুগণ! মায়ের নামে শপথ করো—তোমরাও পিছু হটবে না! আমার মৃত্যুর পর—একে একে সবাই মরবে।

মাতৃ-উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কেউ বেঁচে থাকার অধিকারী নই...

দার্শনিক আনন্দে আত্মহারাভাবে চিৎকার করে ওঠে—জয় মৃত্যুঞ্জয় নরেশের জয় !

সহস্রকণ্ঠে সে জয়-ঘোষণার প্রতিধ্বনি আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে। দূরে প্রাসাদ-চূড়ায় গিয়েও আঘাত করে সেই গগনভেদী উচ্চ চিৎকার। নহবতের সানাই স্তব্ধ হয়ে যায়। চমকিতভাবে রাণী-বসুন্ধরা ছুটে এসে দাঁড়ান বাইরের অলিন্দে। শঙ্কিতভাবে চেয়ে থাকেন দিগন্তের দিকে। দূরে খরস্রোতা মধুমতীর উত্তাল তরঙ্গ আকর্ষণ করে তার দৃষ্টি। নদীর ওপারে আকাশের গায়ে—ও কি ? ভয়ঙ্করী এলোকেশীর রক্তমাখা কেশগুচ্ছের মত একখণ্ড কালো মেঘের উপর পড়েছে অস্তগামী সূর্য্যের রক্তরাগ ! ও কি বিশ্রী মেঘ ! বসুন্ধরা শিউরে ওঠেন।

বিজ্ঞানীকে ডেকে বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করেন—চাষীপল্লীর জয়ধ্বনি শুনেছ ?

—হ্যাঁ, শুনেছি...

—পারবে ওদের বাধা দিতে ?

—মুর্খের দল দেহের রক্ত দিয়ে রাজপথ রাঙাবে, তবু একজনও পারবে না—সদরের গেট পার হতে। সব ব্যবস্থাই আমি করে রেখেছি...বিজ্ঞানী তার হাতের পিস্তলটা নাচিয়ে আত্ম-প্রত্যয় ও অহঙ্কার প্রকাশ করে।

শোভার কাছে গিয়ে বসুন্ধরা বিদ্রূপের স্বরে বলেন—শুনেছ? তোমার আদুরে চাষী-ছেলেরা আস্‌ছে এই রাজ-প্রাসাদ আক্রমণ করতে…

শোভা বলে—মানুষের রক্তে মানুষের পিপাসা মিটবে না! আরও বেড়ে যাবে। মুর্খ বিজ্ঞানীকে আর বাড়িয়ে তুলো না! এখনো সাবধান হতে বলো…

—নির্ব্বোধ চাষীরাই বা নিজেদের কবর নিজেরা খুঁড়ছে কেন?

—বিজ্ঞানীকে দূর করে তাড়িয়ে দাও। ওদের আসতে দাও আমার কাছে। খুব শান্ত ভাবেই ওরা ফিরে যাবে। তোমার কোনো অনিষ্ট করবে না…

—তার মানে, শুভ লগ্নে বিজ্ঞানীর সঙ্গে তোর বিয়ে হবে না। এই তো বল্‌তে চাস্‌? সে কথা আমি কিছুতেই শুনবো না…

শোভা হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে—নহবতে সানাই বাজালে, আর শাঁখে ফুঁ দিলেই যদি বিয়ে হয়, তাহলে সে বিয়ে আমাকে রোজ একটা করে দিতে পার। উৎসব-আয়োজনে রাজপুরী মাতিয়ে রাখতে পার। কে তোমাকে বাধা দেবে? সে উৎসবের আনন্দে—রাজকর্ম্মচারীরা যদি নাচতে পারে—রাজ্যের দরিদ্র প্রজারাই বা নাচবে না কেন? কেন বিজ্ঞানী গুলি চালাবে? তাদের অপরাধ কি?

—সে নোংরা ছোটলোকদের তো আমি নেমন্তন্ন করিনি?

রবাহুত কাঙালীদের মত কেন তারা আস্‌বে এখানে ? শোভার চোখমুখ রাঙা হ'য়ে ওঠে। অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিতভাবে সে বলে—মা! রবাহুত কাঙালী একদিন তুমিও ছিলে। সে কথা আমি জানি……

কোন বিষাক্ত সরীসৃপের দংশন-জ্বালায় বসুন্ধরা যেন বিবর্ণ হয়ে পড়েন। অসহ্য যন্ত্রণায় অতি অস্থিরভাবে চিৎকার করে বলেন—কে তোকে বলেছে সে কথা ? আমি তার জিভ টেনে ছিঁড়বো……

শোভা হাসে। সে হাসি দেখে বসুন্ধরার উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। চিৎকার করেই বলেন—দার্শনিক কি বলেছে জানিস্ ?

—কি ?

—তোর ছেলের দাবী নিয়ে চাষীরাই নাকি হবে, এই রাজপ্রসাদের মালিক! কী স্পর্দ্ধার কথা! তারা আস্‌ছে রক্ত-গঙ্গায় ভাস্‌তে…

—নরেশ যদি আসে তাদের সঙ্গে ?

—সেও মরবে…

শোভা চম্‌কে ওঠে। বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করে—সে কথা তুমি ভাবতে পার ?

—কেন পারবো না ? মা হ'য়ে নরেশকে তো মেরে ফেলেছিস্ তুই। রাজকুমার-নরেশ আজ একটা নীচ ছোটলোকের ছেলে—অতি হীন-চাষী! তার মরণ-কামনা কেন করবো না আমি ?

—নরেশের মরণ-কামনা করবে ?

—নিশ্চয়ই করবো…

নির্ব্বাক বিস্ময়ে শোভা চেয়ে থাকে বসুন্ধরার মুখের দিকে। তার রক্তিম গণ্ড বেয়ে মুক্তা-ধারার মত অশ্রু-বিন্দু গড়িয়ে পড়ে। বুক ভেসে যায়। নরেশের মা শোভা, আর শোভার মা বসুন্ধরা! এই দুই মার প্রকৃতিগত বৈষম্য আর দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরিত্য আজ চরম সংঘর্ষের সম্মুখীন হ'য়ে পড়েছে! শোভার নয়নমণি নরেশ কি হবে তার বলি? আতঙ্কে শোভার দেহ বিবর্ণ ও মন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। তার জলভরা ঝাপ্সা চোখে ভেসে ওঠে নরেশের মৃত্যু-বিভীষিকা! সত্যিই কি নরেশ মরবে? না, না, তা' হতে পারে না। কবি বলেছে—সে হবে মৃত্যুঞ্জয়—নরশ্রেষ্ঠ নরেশ!

সন্ধ্যা লগ্নেই শোভার বিয়ে। বসুন্ধরার আদেশে পরিচারিকারা এসে শোভাকে সাজায়—বহুমূল্য অলঙ্কার আর বেশ-ভূষা দিয়ে। শোভা যেন সংজ্ঞাহীন নিশ্চল প্রস্তর-মূর্ত্তি !

নারায়ণের প্রতীক্ষায় বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী যেন বসে আছেন রত্ন-সিংহাসনে। বিজ্ঞানী-নারায়ণ কেন সাহসী হচ্ছেন না কাছে আসতে ? সভয়ে দেখছেন দূরে দাঁড়িয়ে। সৌন্দর্য্যের কী তেজ ! কী দীপ্তি ! চোখ যেন ঝল্‌সে যায়।

বিজ্ঞানী কোনদিনই সাহস করেনি বন্দিনী শোভার খুব নিকটবর্ত্তী হতে। আজ সে দূরত্ব আরও বেড়ে ওঠে। বিজ্ঞানীর অন্তরের দৈন্য যেন অপরাধীর মত ধরা পড়ে যায়। পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। কোমরে পিস্তল থাকলেও, বাহুতে কেন বল নেই ? এতদিন দূরে দাঁড়িয়েই সে বলেছে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। জানিয়েছে লোভাতুরের মর্ম্ম-বেদনা, আর শুনেছে তেজস্বিনী শোভার কঠোর মন্তব্য। আজ শোভার চোখে চোখ পড়লেই বিজ্ঞানীর চোখ দুটো যেন অন্ধ হয়ে আসে। অন্ধ চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনিশ্চিত অন্ধকারের বিভীষিকা !

করুণাময়ী শোভা। সন্তান-সন্দর্শনের প্রতীক্ষায় রাজ-রাজেশ্বরীর অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি ! বক্ষে তার স্নেহ-কাতরতা। সে

যেন সংযম ও সহিষ্ণুতা দিয়ে গড়া কবি-মানসের চিত্রার্পিত আলেখ্য। জীবনের মমত্ব-বোধ যার নেই, এই নির্ম্মম পৃথিবীর সব নির্য্যাতন সে দেখে উপেক্ষার অচঞ্চল দৃষ্টি দিয়ে। বসুন্ধরার আচরণে সে দুঃখিত। বিজ্ঞানীর বিরুদ্ধেও তো নেই তার কোন অভিযোগ ? মাতৃবক্ষে কোন বিদ্বেষবুদ্ধি কি জাগে ?

ভীত ও সঙ্কুচিত বিজ্ঞানী। অভয়া-শোভা—তাকে সস্নেহে কাছে ডাকে। বিস্মিত বিজ্ঞানী সভয়ে এসে নতজানু হয় শোভার পায়ের কাছে।

কাতরভাবে শোভা জিজ্ঞাসা করে—ওই পিস্তল দিয়ে নরেশকে তুমি গুলি করবে ?

স্বেদসিক্ত কপাল মুছে বিজ্ঞানী উঠে দাঁড়ায়। সদম্ভে বলে —প্রয়োজন হ'লে নিশ্চয়ই করবো···

—পারবে ? আমি যে নরেশের মা। নিজের মায়ের মুখখানা মনে পড়েও কি হাত কাঁপবে না ?

—আমার মনে কোন দুর্ব্বলতা নেই···

—তবে, কাঁপছ কেন ?

—কাঁপলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবো না···

—পিস্তলটা আমাকে দেবে ?

—কেন ?

—নরেশের মৃত্যুর আগে, আমি মরতে চাই···

অধোবদনে লজ্জিতভাবে বিজ্ঞানী চুপ করে থাকে। কোন কথা বলে না।

হঠাৎ প্রাসাদের বাইরে শোনা যায় নরেশের জয়ধ্বনি ! দুজনাই চম্‌কে ওঠে। পিস্তলহাতে বিজ্ঞানী ছুটে যায় বাইরের দিকে। শোভা ছুটে যায় একটা জানালার ধারে।

বাইরে উঁকি দিয়ে শোভা যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। ওই যে নরেশকে দেখা যাচ্ছে ! কত দিন পরে আজ সে নরেশের মুখখানি দেখতে পেয়েছে। চিৎকার করে বসুন্ধরাকে বলে—মা, মা, দেখে যাও, আমার নরেশ কি সুন্দর সেজে এসেছে। আমাকে কি বিশ্রী সাজিয়েছে তুমি। নরেশের রূপসজ্জার কাছে তো আমি হেরে গেছি—কী লজ্জা !

মা-বসুন্ধরা তখন বাইরে থেকে শোভার কক্ষের দ্বারে তালা পরাচ্ছেন। সে যেন নরেশের কাছে ছুটে যেতে না পারে।

চাষী-বালকরা নরেশকে সাজিয়াছে—ফুলসাজে। যেন মূৰ্ত্তিমান কন্দর্প ! প্রখর সূর্য্যতাপে গাছের ফুলপাতা দুষ্প্রাপ্য হলেও, নরেশকে সাজাতে তার সঙ্গীরা একটুও কার্পণ্য করেনি। রং-বে-রংয়ের কাগজের ফুলপাতায় বিচিত্র সে রূপ-সজ্জা !

নরেশের গলায় দোলে রক্ত-করবী আর নীল-অপরাজিতার মালা। চূড়া বাঁধা কেশ-গুচ্ছ পাঁচ-রঙা ফুল দিয়ে সাজানো। কানে—কৃষ্ণচূড়ার কুণ্ডল, আর বাহুতে বাঁধা কদম্বের কঙ্কন। তপ্ত-কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল তার সুকুমার দেহের দীপ্তি। জলভরা পদ্ম-পাপড়ীর মত আনন্দোজ্জ্বল চোখদুটি যেন উচ্ছ্বাসে টল্‌মল্‌

করছে। মুখশ্রীতে সঙ্কল্পের অপূর্ব্ব দৃঢ়তা। যেন মুর্ত্তিমান আনন্দ এসেছে—মূর্ত্তিমতী করুণাকে দেখতে !

নানাফুলে সাজানো একতারা বাজিয়ে নরেশ গায়—

মা আমার আনন্দময়ী,
আমি তার আদুরে ছেলে।
কেন দূরে থাক্‌বো আমি—
এমন মধুর মাকে ফেলে ?

আমার বুকের রক্তধারা
কে দিয়েছে ওই মা ছাড়া ?
গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা—
করব বুকের রক্ত ঢেলে।

গান শুন্‌তে শুন্‌তে শোভা যেন উন্মাদিনী হয়ে ওঠে। অঙ্গের অলঙ্কার খুলে ঘরময় ছড়িয়ে ফেলে। মূল্যবান বেশভূষা ছেড়ে পট্টবস্ত্র পরে। খোঁপা খুলে চুল দেয় এলিয়ে। নরেশ এসেছে বুকের রক্ত ঢাল্‌তে। না, না, তা' হতে পারে না। শোভা বেঁচে থাকতে নরেশ মরতে পারবে না। জানলা-পথে উঁকি দিয়ে বসুন্ধরা দেখেন্ শোভার বেশ-পরিবর্ত্তন। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করতে সাহসী হন না।

চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে শোভা বলে—মা, মা, দরজা খোল। একবার আমি যাবো নরেশের কাছে। তাকে এই বুকে একটু জড়িয়ে ধরবো। বুকটা বড্ড জ্বলে যাচ্ছে। আর

সহ্য করতে পারছি না। মা, মা, তোমার পায় পড়ি—দরজাটা একবার খোলো…

সে আর্ত্তনাদ বসুন্ধরা শুনেও শোনেন না। চাবি আঁচলে বেঁধে ব্যস্তভাবে চলে যান বিজ্ঞানীর খোঁজে।

রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের বাইরে রাজপথে দাঁড়িয়ে, দ্বাররক্ষীদের সম্বোধন ক'রে দার্শনিক বলে—জানো তোমরা ওই তরুণ-কিশোর কে? তোমরা কি ওকে চিনতে পারছ না?

একতারার ঝঙ্কার তুলে, নেচে নেচে নরেশ গায়—

রাজার কুমার এলো—
ভিখারী সাজে,
কেউ চেনেনা—চেনেনা—
এই নিলাজে!
তার চূড়াতে ফুল—
গলে মালা দোদুল;
তার হাতে আকুল
একতারাটি বাজে।
দুটি নয়ন-ধারায়
তার বুক ভেসে যায়—
মার চরণ সে চায়'
এই বুকেরি মাঝে।

নরেশকে দেখেই দ্বাররক্ষীরা চিনে ফেলেছে। এই রাজ-পুরীতে ছিল একদিন তার অবাধ গতিবিধি। প্রত্যেকটি

পুষ্পবীথির সঙ্গে ছিল প্রাণের পরিচয়। রাজপ্রাসাদের কক্ষগুলি মুখরিত থাকতো যার উচ্ছ্বসিত কলহাস্যে, তাকে কে না চেনে? ছাই দিয়ে ঢাকলেও, আগুনের উত্তাপ কি লুকানো যায়? দ্বাররক্ষীরা অভিবাদন জানিয়ে, দ্বার ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। মুখে বলে—জয় রাজকুমারের জয়!

পিস্তল-হাতে বিজ্ঞানী এসে হুকুম জারি করে—গেটের দরজা বন্ধ করো…

কে সেই বিজ্ঞানী? তার হুকুম কে শোনে? রক্ষীরা বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। বাদ-প্রতিবাদে বিজ্ঞানীকে অগ্রাহ্য করে—অবজ্ঞা করে। বিজ্ঞানী ছুটে যায়—বসুন্ধরার কাছে।

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে, নিরুপায় বসুন্ধরা বলেন—নরেশ তুমি একলা এসো ভিতরে। আর কেউ যেন আসে না তোমার সঙ্গে…

নরেশ সে প্রস্তাবে রাজী হয় না। তার দাবী—যারা সঙ্গে এসেছে, তাদের সবাইকে দিতে হবে প্রবেশাধিকার। রাজকন্যা শোভা তো আজ একা নরেশের মা নন্? হাজার হাজার সন্তান তার। সন্তানকে মায়ের চরণ-দর্শনে বঞ্চিত করবে কে? কোনো বাধা তারা মানবে না। বসুন্ধরার হুকুম অমান্য করে, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে নরেশ পার হয়ে যায় সদরের সিংহদ্বার। কেউ বাধা দিতে অগ্রসর হয় না।

নন্দন-কাননের মত বিস্তীর্ণ ও সুসজ্জিত পুষ্পোদ্যানে ঢুকে চাষী-যুবকরা বিস্মিতভাবে চারিদিকে চায়। খাদ্যশস্যের মাঠ

শুকিয়ে গেছে—ধূলি-ধূসরিত বিবর্ণ মাটিতে একটিও জীবিত তৃণের সন্ধান মেলে না। কিন্তু, কৃত্রিম ফোয়ারার সাহায্যে এখানে তো অক্ষুণ্ণ রয়েছে সবুজের লীলা! কত ফুল, কত ফল, কত জল! বিজ্ঞানীর বাহাদুরীকে তারা মনে মনে স্বীকার করে।

প্রাসাদের দরজায় গুলিভরা পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে বিজ্ঞানী। খুব কাছে গিয়ে নরেশ একটা নমস্কার নিবেদন করে। কয়েকজন সাহসী বন্ধুও এগিয়ে যায় তার সাথে।

বিজ্ঞানী বলে—প্রাণের মমতা যদি থাকে তা'হলে আর অগ্রসর হয়ো না…

উপেক্ষার হাসি হেসে নরেশ বলে—প্রাণের চেয়ে মা যে সন্তানের কাছে কত বেশী প্রিয়, তা' কি আপনি জানেন না? আপনার কি মা নেই? গুলি করুন আমাকে…

দার্শনিক ছুটে গিয়ে দাঁড়ায় বিজ্ঞানীর উদ্যত পিস্তলের সাম্‌নে। করজোড়ে সবিনয়ে বলে—গুলি ক'রে নরেশের বুকটা বিঁধ্‌বার আগে, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও বন্ধু!

—কি' বলো?

—কত গুলি-বারুদ আছে তোমার কাছে? কত জনকে হত্যা করতে পারবে তুমি?

বসুন্ধরা উত্তেজিতভাবে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি তা' জান্‌তে চাও কেন?

দার্শনিক হেসে বলে—মাতৃদর্শনে উৎসুক ওই ভাবোন্মত্ত

জন-সমুদ্রকে কতক্ষণ অহিংস রাখ্‌তে পারবো—সে কথাটা হিসেব করে বুঝ্‌তে চাই···

বিজ্ঞানী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে—কতজনকে হত্যা করার পর—তারা হিংস্র হ'য়ে উঠ্‌বে মনে করো ?

—নরেশ একাই একশো। তাকে হত্যা করলে—কেউ আর অহিংস থাক্‌বে কিনা, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে···

বিজ্ঞানী হো হো করে হেসে ওঠে। হাস্‌তে হাস্‌তে বলে—তা'হলে তোমার অহিংস-সংগ্রামের পরিকল্পনা মিথ্যা প্রমাণিত হবে তো ? তোমার হিসাবে তুমিই তখন হেরে যাবে। আর, আমার হবে জয়। তাই নয় কি ? আজকার এ শক্তি-পরীক্ষা তো তোমার সঙ্গে আমার ?

—সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু—দার্শনিক উত্তেজিত হয়ে ওঠে। চিৎকার করে বলে—কিন্তু, অহিংস-নীতি মানুষের জন্যে, হিংস্র-শার্দ্দুলের জন্যে নয়···

—তা' সত্যি ! বিদ্রূপের সুরে বলে বিজ্ঞানী—তবে, বলো তো বন্ধু ! নিরস্ত্র জনগণের পক্ষে হিংস্র-হওয়া সম্ভব হবে কি করে ?

দার্শনিকও বিদ্রূপের সুরে বলে—সহজাত দাঁত ও নখ তো তাদের সঙ্গেই আছে ! তাই দিয়েই পারবে তারা তোমাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেল্‌তে···

—সে নৃশংসতা তুমিও সমর্থন করবে তো ? অতএব, আমার

মত পশুত্ব তোমার মধ্যেও আছে, তোমার সঙ্গীদের মধ্যেও আছে। আমি একাই পশু নই। স্বীকার করো···

—সে কথা তো আগেই বলেছি একদিন। অহিংসা সাধন-সাপেক্ষ। হিংসাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। জীবন-কবির শিষ্য আমি আর নরেশ আমরণ অহিংস থাক্‌বো—এ প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নেই, ওই চঞ্চল-চিত্ত ও ভাবোন্মত্ত জনতার দিক থেকে।

—তা' হলে ওদের নিয়ে এসেছ কেন? .

—ভুল করেছি। তাই তোমাকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি—নরেশকে গুলি করো না···

বিজ্ঞানী বলে—আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোনো নির্দ্দেশ দিও না বন্ধু! নরেশকে বলো—ওদের 'নিয়ে' ফিরে যেতে···

—তুমি কি বলো নরেশ? নরেশের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে দার্শনিক। ফিরে যাবে?

নরেশ বলে—আমি কোনো মতবাদের সমর্থন জানাতে আসিনি এখানে। আমি এসেছি, আমার মাকে দেখ্‌তে। মাতৃদর্শনের আগ্রহ আমার রক্তের দাবী। মার বুকে মাথা-রাখা আমার জন্মগত অধিকার। কেউ আমাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না···

বসুন্ধরা বলেন—বেশ তো, তুমি ভিতরে এসো। ওদের ফিরে যেতে বলো ··

—আমি যে অতি হীন চাষী। আমার মা আজ ওদেরও

মা। এই মাতৃ-তীর্থে এসে, মাতৃ-দর্শনের পুণ্য থেকে ওরাই বা কেন বঞ্চিত হবে?

সমস্যার মীমাংসা হয় না।

একজন পরিচারিকা ছুটে যায় শোভার কাছে। জান্‌লা-পথে তাকে জানায়—বিজ্ঞানী পিস্তল তুলে ধরেছে নরেশের বুকের উপর। সে কথা শুনে রুদ্ধদ্বারে মাথা ঠুকে শোভা তার কপালটা রক্তাক্ত করে তোলে। পারচারিকাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানায়—বাইরের দিক থেকে দরজাটা খুলে দিতে।

পরিচারিকা শুধু সংবাদ দিতে আসে নি, শোভাকে মুক্তি দিতেও এসেছে। সে সন্তানের মা। নরেশের মুখের দিকে চেয়ে তার মাতৃস্নেহ উথ্‌লে ওঠে। সে আর স্থির থাকতে পারে না। অন্যমনস্কা বসুন্ধরার আঁচল থেকে চাবিটী নিয়ে এসেছে চুরি করে। মনে মনে সঙ্কল্প করেছে—শোভাকে মুক্তি দিয়েই এ পাপ-রাজপুরী ত্যাগ করে, জন্মের মত যাবে পালিয়ে।

এদিক-ওদিক চেয়ে পরিচারিকা অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে দেয়। শোভা বেরিয়ে পড়ে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে—দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানহারা হয়ে।

অন্যদিকে নরেশের কাছে গিয়ে বসুন্ধরা আবার বলেন—নরেশ! আমার অনুরোধ রাখো। তুমি একলাই এসো ভিতরে। ওদের ফিরে যেতে বলো…

নরেশ দুঃখিতভাবে বলে—না, না, তা' হয় না দিদিমা!

তা' হলে আমরা কেউ আর ভিতরে যেতে চাই না। আমাদের মাকে একবার বাইরে আসবার অনুমতি দাও...

বসুন্ধরা উত্তেজিতভাবে বলেন—সে অনুমতি আমি কথ্‌খনো দেবো না। শোভা এখানে আসবে না। আসতে পারবে না...

—কে তাকে বাধা দেবে? আমরা যে এসেছি তাকে উদ্ধার করতে...

—উদ্ধার করতে, কথাটার মানে কি? গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে বিজ্ঞানী।

—শুনেছি—তিনি বন্দিনী!

বসুন্ধরা বলেন—হ্যাঁ বন্দিনী। অবাধ্য মেয়েকে বন্দিনী রেখে, তার ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করার অধিকার আমার আছে। আমি তার মা...

—আমি তার ছেলে। আমার মার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার স্বাধীনতা কেউ ক্ষুন্ন করতে পারবে না, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে...

রাণী-বসুন্ধরা ক্রোধে কাঁপ্‌তে থাকেন। উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে বলেন—বিজ্ঞানী! আমার আদেশ, ওই কাল-কেউটেকে গুলি করো! এখুনি গুলি করো...

ঠিক এই সময়ে শাবকহারা সিংহিণীর মত উন্মাদিনী শোভা ছুটে আসে। নরেশকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে। রোষ-কষায়িত চোখে বিজ্ঞানীর নিস্প্রভ চোখের দিকে চেয়ে বলে—

হ্যাঁ, গুলি করো। আমার স্নেহময়ী মার আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করো। ছুটো বুক এক সঙ্গেই বিঁধে ফেলো…

বিজ্ঞানী তার পিস্তলটা বসুন্ধরার পায়ের কাছে রেখে বলে —মা! আমি এখন আসি তা'হলে?

—তুমি চলে যাবে?

—আর কি করবো বলুন? যে শিক্ষা-লাভ ক'রে যাচ্ছি, আজ থেকে বিশ্ববাসীর কাছে তা প্রচার করবো। শোভাকে আমি ভালবাসি। তাকে তো ধ্বংস করতে পারবো না?

অনুসন্ধিৎসুভাবে দার্শনিক জিজ্ঞাসা করে—কি শিক্ষা-লাভ করলে, সে কথাটা আমাদের কাছেও বলো। বিশ্ববাসী যা জানবে, আমরাই বা কেন তা জানবো না?

—নিশ্চয়ই জান্‌বে। তোমরা তো বিশ্বের বাইরে নও? তবে, ব্যক্তিগতভাবে তোমার উৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ ঘটেনি বন্ধু! তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করছি না। যতই বাহাদুরী দেখাও, আমি জানি, এখুনি একটি গুলি চালিয়ে তোমাকেও পারি নীতিভ্রষ্ট করতে…

—কখ্‌খনো পারো না…

বিজ্ঞানী একটু হেসে বলে—সে শক্তি-পরীক্ষার সুযোগ তো হারিয়ে ফেলেছি বন্ধু! আর কেন? তবে, একটি কথা আমি স্বীকার করে যাচ্ছি। বিজ্ঞান মানুষকে সুখী করতে পারে, সম্পন্ন করতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই পারে না তার মনকে বশীভূত করতে। আমরা রাজত্ব চালাই, বাইরের

বস্তু-বিচার নিয়ে। কিন্তু মন-রাজ্যের কোন খবর রাখি না। রাখ্‌বার জন্যে মাথাও ঘামাই না…

দার্শনিক বলে—সেইখানেই তো তোমরা হেরে যাও আমাদের কাছে…

—তোমরা যে কোন্‌খানে হেরে যাও—সে কথাও আজ আমার জানা হয়ে গেছে…

—কোন্‌খানে বলো তো ?

—দুঃখ ও দারিদ্র্যের প্রতিকারের জন্যে তোমরা চেয়ে থাকো আকাশের দিকে। অনির্দ্দিষ্ট অদৃষ্টের দিকে। অনাবৃষ্টির জন্যে মাঠের মাটি শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে। আর, এখানে আমি কি করেছি—দেখ্‌তে পাচ্ছ ? যন্ত্রের সাহায্যে পাতালের জল টেনে তুলে ছড়িয়ে দিয়েছি চারি দিকে। রাজপুরীর আবহাওয়া শীতল রেখেছি। আমার উদ্যান-রচনা অম্লান আছে। বৃক্ষলতার শ্যামলিমা অক্ষুণ্ণ আছে। মানুষের কল্যাণ-কামনায় আমার এ কৃতিত্ব কি মূল্যহীন মনে করো ?

—কিন্তু শোভাদেবীর সঙ্গে তোমার এই আচরণের কৈফিয়ৎ কি ?

—সুন্দরের উপাসক আমি। বসুন্ধরার বুকে সুন্দরী শোভাকে আমি চেয়েছি—ওই উদ্যানের মতই অম্লান রাখ্‌তে ! স্নেহকাতর শোভা আমার সে উদ্দেশ্য বুঝলেন না। তাই তো চলে যাচ্ছি আমি…

—না, না, তুমি যেও না বিজ্ঞানী! বসুন্ধরা কাতরভাবে চেপে ধরেন বিজ্ঞানীর হাত দু'খানা। অনুনয়ের সুরে বলেন —তোমার উদ্দেশ্য—ওই মূর্খ শোভা আজ না বুঝলেও, কাল বুঝবে। নিশ্চয়ই সে আত্মঘাতী হবে না...

বিজ্ঞানী একটু হেসে বলে—মা! সত্যকে অস্বীকার করবো না। বিজ্ঞানের চেষ্টাই হলো—সত্য-আবিষ্কার। সত্য-গোপন নয়। এ কথা আজ আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি—বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি মানুষকে সুখী করতে পারছে না। দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে তুলেও, অন্তরের দৈন্য দূর করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। মনকে অগ্রাহ্য করে, আমরা ভুল-পথে চলেছি বলেই বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। আজ আমি খুব স্পষ্টভাবে বুঝেছি—জগতের সুখ ও শান্তি নির্ভর করছে—প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য বস্তু-তান্ত্রিকতার মিলনে। বিচ্ছেদে নয়।

শোভার দিকে চেয়ে বিজ্ঞানীর চোখদুটি সজল হয়ে ওঠে। চোখ মুছে বলে—আমি জানি—এই মিলনই ছিল জীবন-কবির কাম্য। একতারা বাজিয়ে তিনি চেয়েছিলেন—দর্শন ও বিজ্ঞানের মিলন-সেতু রচনা করতে। সেই মিলনের মহিমা প্রচার করতে। আমার উচিত ছিল তার শিষ্যত্ব-গ্রহণ করা। বসুন্ধরা ভুল বুঝেছিলেন। এই রাজপুরী থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে অত্যন্ত ভুল করেছিলেন।

—সে ভুল-সংশোধনের কি কোন উপায় নেই? বসুন্ধরা কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করেন।

বিজ্ঞানী বলে—হ্যাঁ আছে। ওই নরেশকে আপনি গ্রহণ করুন। আমার আর কোন কর্ত্তব্য নেই এখানে। বিদায়! শোভাদেবি! বিদায়···

বিজ্ঞানী মাথা-নীচু করে, চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে চলে যায়। বসুন্ধরা মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েন।

বসুন্ধরার বুকে হাত রেখে শোভা চম্‌কে ওঠে। মনে হয় তার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে। কী সর্ব্বনাশ!

কাতরভাবে নরেশের দিকে চেয়ে শোভা বলে—নরেশ! শীগ্‌গীর ছুটে যাও—বিজ্ঞানীকে ফিরিয়ে আনো···

বিস্মিতভাবে নরেশ জিজ্ঞাসা করে—কেন মা?

—সে ছাড়া আর কেউ তো পারবে না, মা-বসুন্ধরাকে বাঁচাতে!

চিন্তিতভাবে নরেশ বেরিয়ে পড়ে—বিজ্ঞানীর খোঁজে। দার্শনিক তার মুণ্ডিতমস্তকে হাত বুলিয়ে ভাবে—তাই তো, একি হলো? বিজ্ঞানীকে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে? কী আশ্চর্য্য!

———